BDeBooks.com

মৃন্ময়ীর মন ভালো নেই

হুমায়ূন আহমেদ

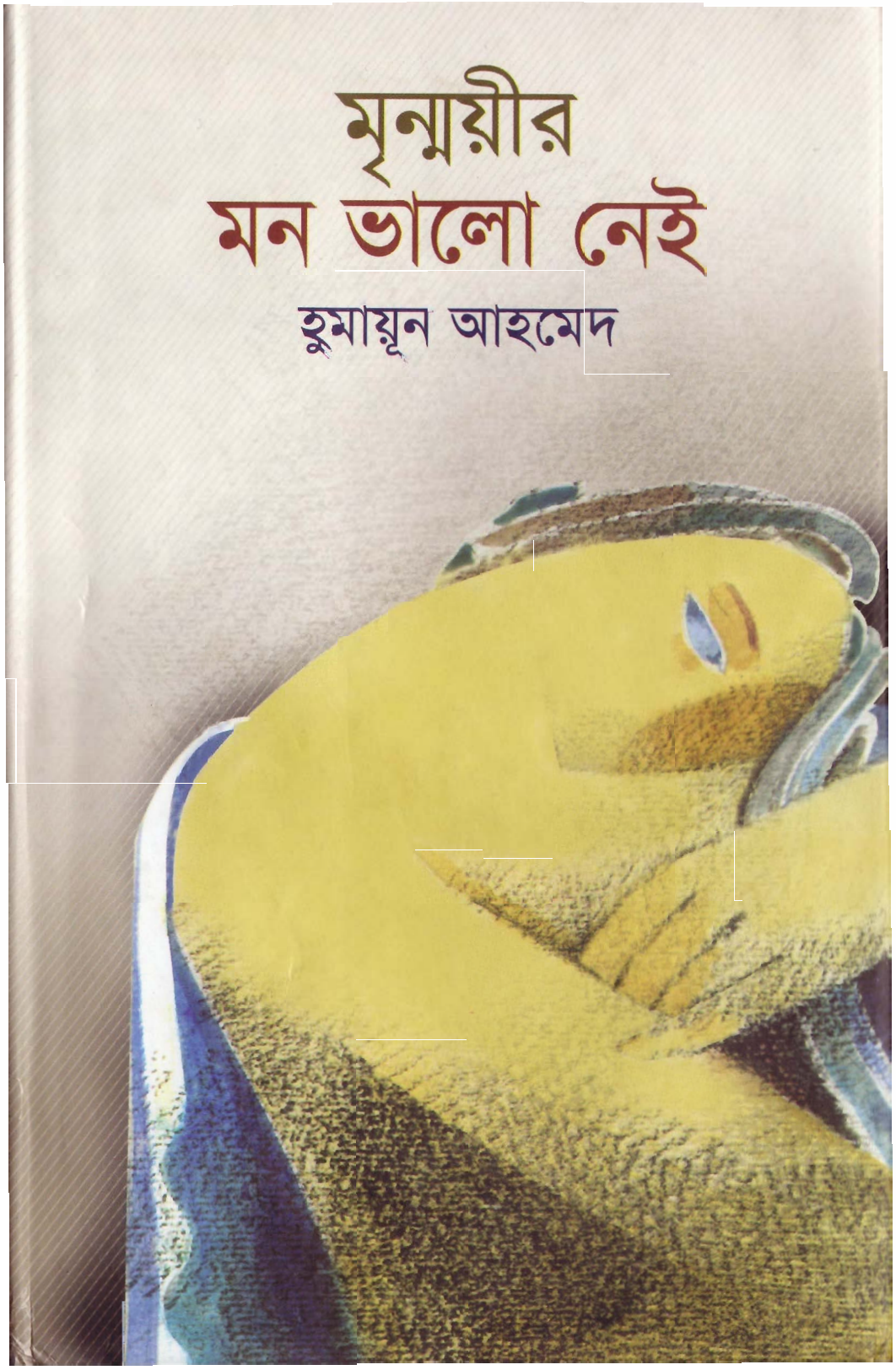

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

©
লেখক

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

অক্ষর বিন্যাস
দিদারুল আলম শামীম
কম্পিউটার গ্যালাক্সী
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম ১০০ টাকা

MRINMOYEER MON VALO NAI by Humayun Ahmed
Published by A. K. Nasir Ahmed Salim
Kakali Prokashoni, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price : Tk. 100.00

ISBN 984-437-345-X

তিনি সব সময় হাসেন।
যতবার তাঁকে দেখেছি,
হাসিমুখ দেখেছি।
আমার জানতে ইচ্ছা করে
জীবনের কঠিন দুঃসময়ে
তিনি যখন কলম হাতে নিয়েছিলেন
তখনও কি তাঁর মুখে হাসি ছিল?

সর্বজন প্রিয়
আমাদের
রাবেয়া খাতুন

মৃন্ময়ীর ঘুম ভাঙানোর মহান দায়িত্ব যে-কাজের মেয়েটি পালন করে তার নাম— 'বিন্তি'। তার বয়স মৃন্ময়ীর কাছাকাছি— সতেরো। মৃন্ময়ীর উনিশ। বিন্তি এসেছে নেত্রকোনার দুর্গাপুর থেকে। এই প্রথম তার ঢাকা শহরে আসা। বড়লোকদের কাণ্ডকারখানা কিছুই তার মাথায় এখনো ঢুকছে না। ভয়ে সারাক্ষণই তার 'কইলজা' কাঁপে এবং 'পেট পুড়ে' দুর্গাপুরের জন্যে।

সকাল আটটা। বিন্তি চায়ের কাপ নিয়ে মৃন্ময়ীর ঘরে ঢুকেছে। তার কলিজা কাঁপা শুরু হয়েছে। সে জানে মৃন্ময়ী এক্ষুনি তাকে কঠিন ধমক দেবে। ঘুম ভাঙলে মৃন্ময়ীর মেজাজ খারাপ থাকে। তার দায়িত্ব ভোর আটটায় আপার ঘুম ভাঙানো। আপা নিজেই তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে অথচ...

যথাসম্ভব নরম গলায় বিন্তি ডাকল, আপা! আপা!

মৃন্ময়ী মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে কঠিন গলায় বলল, এমন এক থাপ্পড় খাবে। যাও বললাম। ভোর ছ'টার সময় বলে আপা। আপা।

আপা আটটা বাজে।

বাজুক আটটা। আমি এক থেকে তিন গুনব। এর মধ্যে তুমি যদি না যাও তা হলে থাপ্পড় খাবে। সত্যি সত্যি খাবে। এক থাপ্পড়ে দুর্গাপুর।

এই সময় বিন্তির কী করা উচিত সে ভেবে পায় না। তার কি উচিত চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা? নাকি সে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে আসবে? সমস্যাটা নিয়ে সে রহিমার মা'র সঙ্গে আলোচনা করেছে। রহিমার মা এই বাড়ির হেড বাবুর্চি। অনেক দিন ধরে এদের সঙ্গে আছে। রহিমার মা বলেছে, খাম্বার মতো খাড়ায়া থাকবি। নড়বি না। আফা ধমক-ধামক মুখে দিব। আর যদি চড় মারে মারব। বড়লোকদের চড়ে মজা আছে।

কী মজা?

চড় দিয়া বসলে আফার মন হইব খারাপ। তোরে দিব বখশিশ। পাঁচশ টেকাও পাইতে পারস। আফার ব্যাগে ভাংতি থাকে না। আর এরার টেকার নাই হিসাব।

রহিমার মা সব কথাই বাড়িয়ে বলে তবে এদের টাকার যে হিসাব নাই এই কথাটা খুব সম্ভব সত্যি। আপার ঘর গুছাতে গিয়ে একবার সে এমন ধাক্কা খেয়েছিল— চিরুনি রাখার ডালায় পাঁচশ টাকার একটা প্যাকেট। রাবার দিয়ে বাঁধা। সবই চকচকা নোট। যাদের টাকার হিসাব নাই তারাই এত টাকা এইভাবে ফেলে রাখতে পারে।

আজ বিন্তির ভাগ্য খুবই ভালো। একবার ডাকতেই মৃন্ময়ী উঠে পড়ল। বিন্তির হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে সহজ গলায় বলল, বিন্তি মা'কে একটু আসতে বল। খুবই জরুরি।

আপা ঘর গুছাব না?

ঘর গুছাতে হবে না। ঘর আরো নোংরা কর।

বিন্তি বের হয়ে গেল। আপার মেজাজ আজ কোন দিকে যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। ঘর আরো নোংরা কর কথাটার মানেই বা কী?

মৃন্ময়ীর মায়ের নাম শায়লা। তিনি হাইপার টেনশানের রোগী। কোনো কারণ ছাড়াই তাঁর প্রেশার (সিস্টোলিক) ধুম করে একশ হয়ে যায়। তখন তার ঘাড় ব্যথা করতে থাকে কপালের শিরা দপদপ করতে থাকে। দরজা-জানালা বন্ধ করে তাকে শুয়ে থাকতে হয়। তার ঘরে শীত-গ্রীষ্ম সবসময়ই এসি চলে। ঘরের টেম্পারেচার রাখা হয় ২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। ঘরে একটা জার্মান মেড হিউমিডি ফায়ার আছে, যার কাজ ঘরের জলীয় বাষ্প ৩৫ পারসেন্টে রাখা।

বসন্তকালটা শায়লার জন্য খুব খারাপ কাটে। এই সময় তাঁর অ্যালার্জির এটাক হয়। শ্বাসনালি ফুলে শ্বাস বন্ধের উপক্রম হয়। অ্যালার্জির নানান ধরনের অষুধপত্র খেয়েও কোনো লাভ হয় নি। এখন খাচ্ছেন চাইনিজ হার্বাল মেডিসিন। মনে হয় এই অষুধটা কাজ করছে। বসন্ত শুরু হয়েছে। আমগাছে মুকুল এসেছে। এখনও তার অ্যালার্জির অ্যাটাক শুরু হয় নি।

শায়লা মেয়ের ঘরে ঢুকলেন। চিন্তিত মুখে বললেন, তোর কী নাকি জরুরি কথা?

মৃন্ময়ী বলল, মা বসো। মুখোমুখি বসো।

শায়লা বসলেন। মৃন্ময়ী বলল, আজ প্রেশারের অষুধ খেয়েছ?

নাশতার পরে খাব।

তা হলে যাও প্রেশারের অষুধ খেয়ে তারপর সামনে এসে বসো। আমার কথা শুনে হুট করে প্রেশার বেড়ে যেতে পারে। তখন আরেক যন্ত্রণা।

শায়লা বললেন, তোর কী বলার এখনই বল।

প্রেশার বেড়ে গেলে আমাকে কিন্তু দুষতে পারবে না।

কী বলতে চাচ্ছিস বলে ফ্যাল।

মা আমার তো মনে হয় তোমার প্রেশার এখনই বেড়ে গেছে। নাক ঘামছে।

কথাটা কী?

মৃন্ময়ী চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, কথাটা হচ্ছে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না।

পরশু তোর পরীক্ষা। আজ বলছিস পরীক্ষা দিবি না!

প্রিপারেশন খুবই খারাপ। পরীক্ষা দিলেই ফেল করব। ফেল করার চেয়ে পরীক্ষা না-দেয়া ভালো না?

তোর বাবা জানে?

বাবা জানবে কীভাবে? আমি নিজেই তো জানলাম ঘুম ভাঙার পর। কাল রাতে যখন ঘুমুতে যাচ্ছি তখনও জানতাম পরীক্ষা দিচ্ছি। ঘুম ভাঙার পর মনে হলো— পরীক্ষা কেন দেব? ফেল করার জন্যে পরীক্ষা দেবার কোনো অর্থ হয়?

পরীক্ষা সত্যি দিবি না?

গড প্রমিজ, দেব না।

তোর বাবাকে বল। সে কী বলে শুনি।

মৃন্ময়ী বলল, পরীক্ষা আমি দিচ্ছি, বাবা দিচ্ছে না। কাজেই এখানে বাবার বলার কিছু নেই।

শায়লা বললেন, তোর বাবার তো জানা উচিত যে পরীক্ষা দিচ্ছিস না।

তুমি জানাও। আদর্শ মায়ের দায়িত্ব হলো মিডিয়েটর হিসেবে কাজ করা। মা হলো বাফার জোন। বাফার জোন শব্দটার মানে জান মা?

শায়লা উঠে পড়লেন। তার ঘাড়-ব্যথা শুরু হয়েছে। কপালও দপদপ করছে। গলাও খুস খুস করছে। এলার্জি এটাকের আগে তার গলা খুস খুস করে।

মৃন্ময়ী রিমোট হাতে সিডিপ্লেয়ার চালু করল। কাল রাতে জর্জিয়ান চেন্ট নামের একটা সিডি প্লেয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছিল। সকালে শুনবে এই ছিল পরিকল্পনা। যে-কোনো নতুন মিউজিক ভোরবেলায় শুনতে হয়। রাতে শুনতে হয় পরিচিত পুরানো মিউজিক।

মিউজিক শুনে মৃন্ময়ী হতভম্ব। চার-পাঁচটা মেয়ে শিয়ালের কান্নার মতো হুয়া হুয়া করছে। এদের মধ্যে একজন (মনে হয় সেই দলের লিড সিঙ্গার) একা কিছুক্ষণ হুয়া হুয়া করে। সে থেমে যেতেই বাকিরা ধরে।

বিন্তি দরজা সামান্য খুলে বাইরে থেকে বলল, আপা, আপনেরে নাশতা খাইতে ডাকে।

মৃন্ময়ী বলল, কে ডাকে, মা না বাবা?

খালুজান ডাকেন।

তোমার খালুজানের মানসিক অবস্থা কী? রাগত, নরমাল না হাস্যমুখি?

বিন্তি কিছু বলল না। খালুজানের মুখের দিকে সে ভয়ে তাকাতে পারে না। তিনি 'রাগত' না হাস্যমুখি সে জানে না। জানতে চায়ও না।

মৃন্ময়ী বলল, বিন্তি তোমাকে না বলেছি ঘর অগোছালো করে রাখবে। শুরু কর। বিছানার চাদরটা মাটিতে ফেলে দাও। দুটা বালিশের একটা বিছানায় থাকবে আরেকটা কার্পেটে। বই আর সিডি সারা ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখ।

বিন্তি ভয়ে ভয়ে বলল, আপা সত্যি বলতেছেন?

মৃন্ময়ী বলল, ভাষা ঠিক কর— বলতেছেন, করতেছেন অফ। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতে হবে— বলছেন, করছেন এই রকম। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। নাশতা খেয়ে ফিরে এসে যেন দেখি এ টোটাল মেস। টোটাল মেস শব্দের মানে জান?

না।

টোটাল মেসের মানে হচ্ছে পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা।

মৃন্ময়ীর বাবা শাহেদুর রহমান চৌধুরী পেশায় একজন আর্কিটেক্ট। মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে Water body planning -এ Ph.D. করেছেন। তার রেজাল্ট ছিল অসাধারণ। কিন্তু তিনি এখন পর্যন্ত Water body planning এর কোনো ডিজাইন করেন নি। ভবিষ্যতে করবেন এ রকম মনে হয় না। পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো পরিশ্রমের কাজ তিনি করতে পারেন না। তাতে অবশ্যি তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। শাহেদুর রহমান চৌধুরী সাহেবের বাবা আলিমুর রহমান সাধারণ গেঞ্জি, সুতা এবং রবারের জুতার ব্যবসা করে এত টাকা করেছেন যে তার একমাত্র পুত্রকে জীবিকা নিয়ে কোনো রকম চিন্তা ভাবনায় যেতে হয় নি। অর্থ কী করে মানুষকে অকর্মণ্য করে ফেলে শাহেদুর রহমান তার উদাহরণ। এখন তার সময় কাটে আর্ট কালেক্টর হিসেবে। দেশ-বিদেশের প্রচুর ছবি তিনি জোগাড় করেছেন।

শাহেদুর রহমান বারিধারায় একটা বাড়িতে বাস করেন। বাড়ির চারতলাটা করেছেন ছবির মিউজিয়াম। ছবির সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।

তিনি দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকায় গুলশানে একটা প্লট নিয়েছেন। ছবির মিউজিয়াম সেখানে সরিয়ে নেবেন। মিউজিয়াম তৈরির কাজ শুরু হয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। জমির মালিকানা নিয়ে মামলা শুরু হয়ে গেছে। কোর্ট ইনজাংশান দিয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

নাশতার টেবিলের দিকে মৃন্ময়ীকে আসতে দেখে শাহেদুর রহমান বললেন, হ্যালো বিবি!

এই বিবি সাহেব-বিবি'র বিবি না, এই বিবি হলো Blue Bird-এর সংক্ষেপ। শাহেদুর রহমান তার মেয়েকে সব সময় বিবি ডাকেন।

মৃন্ময়ী বলল, হ্যালো জিবি (Grey bird)!

শুনলাম তুই পরীক্ষা দিচ্ছিস না।

মৃন্ময়ী বসতে বসতে বলল, কে বলেছে, মা?

হ্যাঁ।

মা কোথায়?

তোর কথা শুনে তার মনে হয় প্রেশার বেড়ে গেছে। সে তার ঘরে। প্রেশার মাপার জন্যে ডাক্তার ডাকা হয়েছে।

মৃন্ময়ী পাউরুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল, পরীক্ষা দেব না কেন? পরীক্ষা দিচ্ছি। মাকে ভড়কে দেবার জন্য বলেছি পরীক্ষা দেব না।

প্রিপারেশন কেমন?

ভালো। প্রথমদিন Physical chemistry. এই পেপারটার প্রিপারেশন একটু Down.

শাহেদুর রহমান মেয়ের পাউরুটিতে মাখন লাগানো দেখছেন। আগ্রহ নিয়ে দেখছেন। আগ্রহের কারণ হচ্ছে মাখন লাগানো পাউরুটি মৃন্ময়ী কখনো খায় না। তবে রুটিতে মাখন লাগাতে তার খুবই ভালো লাগে।

শাহেদুর রহমান বললেন, তোর মধ্যে অনেক স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার আছে।

মৃন্ময়ী বলল, তোমার মধ্যেও আছে। বিশাল বিদ্বান এক মানুষ, বিশ পঁচিশ হাজার বই পড়া ছাড়া জীবনে কিছুই করলে না।

সময় তো শেষ হয়ে যায় নি। দেখি তোর মাখন-লাগানো পাউরুটিটা দে। খেয়ে দেখি।

মৃন্ময়ী পাউরুটি এগিয়ে দিতে দিতে বলল, জমি নিয়ে মামলার খবর কী?

কোনো খবর নেই। মামলা চলছে।

তুমি তো ভালো ক্যাচালের মধ্যে পড়েছ।

হুঁ।

তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না তুমি চিন্তিত।

চিন্তিত হয়ে লাভ তো কিছু নেই। লাভ থাকলে বিরাট চিন্তার মধ্যে পড়তাম। তোর মা'র মতো প্রেশার-ট্রেশার বাড়িয়ে ভূমিশয্যা। মামলা শুরু হওয়ায় আমার জন্যে কিন্তু একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে।

কীরকম?

এখন চিন্তা করছি আরো বড় জায়গা নিয়ে কাজ করব। পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমি। ডিজাইন, Water planning মন লাগিয়ে করা যাবে। পানির মাঝখান থেকে শ্বেতপাথরের বিল্ডিং ভেসে উঠল। জলপদ্ম। ধবধবে শাদা পাথরের ফুল। বিল্ডিংটা এমন হবে যেন মনে হয় সে জলে তার নিজের ছায়া দেখছে।

এ-রকম বিল্ডিং তো আছে। লুই কানের ডিজাইন। আমাদের সংসদ ভবন।

আমারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম।

পুরো বিল্ডিং শ্বেতপাথরের?

হুঁ।

অনেক টাকার ব্যাপার। এত টাকা তোমার আছে?

ব্যাংক থেকে ধার নেব। বাবার কাছে হাত পাতব। বাবার কাছে ভিক্ষা চাইতে লজ্জা নেই।

মৃন্ময়ী চায়ের কাপ হাতে উঠতে উঠতে বলল, দাদাজান তোমাকে একটা পাই পয়সাও দেবে না। কাগজ আন। কাগজে লিখে দিচ্ছি।

শাহেদুর রহমান হাসিমুখে বললেন, বাবাকে রাজি করানো আমার জন্য কোনো ব্যাপারই না।

মৃন্ময়ী বলল, সকালে নাশতা খেতে বসেছ, তোমার হাতে বই নেই এটা কেমন কথা। চায়ে একটা চুমুক দেবে এক পাতা পড়বে। এটাই তো তোমার সিস্টেম।

মাঝে মাঝে সিস্টেমের বাইরে যেতে হয়। আমি ঠিক করেছি সপ্তাহে এক দিন কোনো বই পড়ব না। খবরের কাগজও না।

তাতে লাভ?

চোখের রেস্ট। ব্রেইনের রেস্ট। আজ আমার রেস্টের দিন। দেখি এক কাপ চা বানিয়ে দে। মেয়ের হাতে বানানো চা কেমন হয় টেস্ট করে দেখি।

মৃন্ময়ী চায়ের কাপ হাতে নিজের ঘরে ঢুকেছে। ঘর কিছুটা নোংরা করা হয়েছে। আরও হলে ভালো হতো। মৃন্ময়ী হাতের কাপটা টিভির কাছাকাছি ছুড়ে ফেলল। এখন চারদিকে ভাঙা কাচের টুকরা। চা। কিছু চা ছিটকে টিভি-পরদায়ও পড়েছে। বিন্তি ভীত-চোখে তাকিয়ে আছে। মৃন্ময়ী বলল, ঘর অগোছালো করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে একধরনের গোছানো ভাব আছে। বোঝাই যাচ্ছে ইচ্ছা করে ঘর অগোছালো করা হয়েছে। বুঝেছ?

কিছু না বুঝেই বিন্তি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

মৃন্ময়ী বলল, একটা বালিশ ছিঁড়ে বালিশের তুলা চারদিকে ছিটিয়ে দাও। আর কালো মলাটের ঐ মোটা বইটা আন। সবগুলো পাতা কুচিকুচি করে ছিঁড়বে। চার দিকে ছড়িয়ে দেবে।

আপা বই ছিঁড়া ঠিক না।

আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। বই ছেঁড়া খুবই ঠিক আছে। পৃথিবীতে এমন অনেক বই আছে যেগুলি শুধু যে ছিঁড়তে হয় তা না, ছিঁড়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়। বুঝেছ?

জি।

এখনও তুমি বুঝতে পার নি। আমি এ রকম একটা বই কোনো-একদিন তোমাকে দেখাব। পাতায় পাতায় নোংরা ছবি। এখন কাজে লেগে পড়। বালিশের তুলা উড়াবে এবং বই ছিঁড়বে।

বিন্তির খুব ইচ্ছা করছে আপাকে জিজ্ঞেস করতে এই কাজগুলি কেন করা হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল না। সে আবছাভাবে ধারণা করল অতি বড়লোকদের অনেক বিচিত্র খেয়াল থাকে। এইটাও সে রকম কিছু।

মৃন্ময়ী রকিং-চেয়ারে দোল খেতে খেতে টেলিফোনে কথা বলছে। সে তার গলার স্বর অনেকখানি বদলেছে। যে-কেউ মৃন্ময়ীর গলা শুনে ভাববে মৃন্ময়ী ভয়ংকর অসুস্থ— তার শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। শ্বাস কষ্টের অভিনয় করা তার জন্যে তেমন কঠিন কিছু না। মাকে সে দেখছে। মাসে একবার তার শ্বাস কষ্ট হবেই।

ছন্দা ভালো আছিস?

হুঁ।

কী করছিস?

পড়ছি। পরশু পরীক্ষা না!

ও আচ্ছা! পরশু পরীক্ষা।

ছন্দা বলল, তুই এমনভাবে কথা বলছিস কেন? তোর কী হয়েছে?

কিছু হয় নি।

অবশ্যই কিছু একটা হয়েছে।

ছন্দা আমি মারা যাচ্ছি।

কী বললি?

মৃন্ময়ী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কিছু না। Nothing.

এ রকম করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিস কেন?

মৃন্ময়ী টেলিফোন রেখে দিল।

অভিনয় যতটুক করা হয়েছে তাতে ছন্দার খবর হয়ে যাওয়ার কথা। সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে। তবে সময় লাগবে। ঝিকাতলা থেকে বারিধারা। খুব কম করে হলেও চল্লিশ মিনিট। নাটকটা ঠিকমতো সাজানোর জন্যে চল্লিশ মিনিট অনেক সময়। তাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মা'র কাছ থেকে ঘুমের অষুধ এনে রাখতে হবে। একটা দুটা না, এক গাদা। এ ছাড়া নাটক জমবে না।

বিন্তি!

বিন্তি কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, জি আপা! তাকে খালাম্মা বলে দিয়েছেন মৃন্ময়ী যতবার ডাকবে ততবার বিন্তিকে বলতে হবে— জি আপামণি। বার বার ভুল হচ্ছে। ভাগ্যিস খালাম্মার সামনে এখনও হয় নাই।

কাগজ ছেঁড়া কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখ। আমার জন্যে কড়া এক কাপ কফি বানিয়ে আন।

বিন্তি উঠে দাঁড়াতেই মৃন্ময়ী বলল, তুমি কি পড়াশোনা জান?

ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছি।

ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়াশোনা খারাপ কিছু না। Fire and smoke এর বাংলা কী বল।

ধোঁয়া আর আগুন।

আমি বলেছি Fire and smoke, প্রথমে Fire তারপর Smoke, তুমি ধোঁয়া আগে কেন বললে?

ভুল হয়েছে আপামণি। কথার টানে বলেছি। আর বলব না।

ভাই-বোন কত জন?

দুই বোন, ভাই নাই।

ভাই নাই কেন?

বিন্তি মনে-মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, ভাই নাই কেন এই প্রশ্নের সে কী জবাব দেবে? আপা এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন জবাবটা শুনতেই হবে।

ক্লাস নাইনের পর আর পড় নি কেন?

বাপজান আলাদা সংসার করল। আমরা দুই ভইনের নিয়া মা পড়ল

বিপদে।

ভইন কী? বল বোন। আবার বল।

আবার কী বলব আপামণি?

একটু আগে যেটা বলছিলে সেটা।

বিন্তি হতাশ ভঙ্গিতে বলল, বাপজান আলাদা সংসার করল। মা দুই মেয়েরে নিয়া পড়ল মহা বিপদে।

মৃন্ময়ী বলল, বাপজান আলাদা সংসার করল। তার মানে কি আরেকটা বিয়ে করল?

জি।

তোমার সৎমার নাম কী?

চিন্নাই বিবি।

তোমার বোনের নাম কী?

মিন্তি।

তোমার নাম বিন্তি। তোমার বোনের নাম মিন্তি?

আমরার গেরাম দেশের নিয়ম মিল দিয়া নাম রাখা।

শুদ্ধ করে কথা বল, গেরাম না গ্রাম।

বিন্তি বলল, গ্রাম।

তোমার মায়ের নাম কী?

শাহেরা।

তোমার বেতন কত?

আমি জানি না আপা। ম্যানেজার সাহেব বলেছেন উনি সব বিবেচনা করে নির্ধারণ করবেন।

তোমার বেতন যা-ই নির্ধারণ হোক প্রতিমাসের এই তারিখে তুমি আমার কাছ থেকে বখশিশ পাবে। এই বখশিশ হিসাবের বাইরে। খুশি হয়েছ?

জি আপা।

খুশি হলে মুখে হাসি নাই কেন? হাস। সুন্দর করে হাসবে। তারপর কফি বানাতে যাবে।

বিন্তির হাসি আসছে না। হাসো বললেই কি হাসা যায়? তার ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে মৃন্ময়ী নামের পরীর চেয়ে এক হাজার গুণ রূপবতী মেয়েটার মাথার ঠিক নাই। মাথা-খারাপ মানুষের বিশ্বাস নাই। তারা এই ভালো, এই মন্দ।

কী হল? এখনও খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে আছ, হাসছ না কেন?

বিন্তি হাসার চেষ্টা করল।

মৃন্ময়ী বলল, গুড। হাসি সুন্দর হয়েছে। আরও সুন্দর হতে হবে। ঠিকমতো হাসতে পারা মস্ত বড় গুণ। মৃন্ময়ী উঠে দাঁড়াল। তাকে মা'র কাছে থেকে ঘুমের ওষুধ নিতে হবে।

শায়লার ঘরের দরজা-জানালা শুধু যে বন্ধ তা না— দরজা-জানালার উপর ভারী পরদা টানানো। এসি থেকে শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে, হিউমিডিফায়ার বিজ বিজ করছে। তিনি চোখের উপর লেবুর পানি-মেশানো ভেজা টাওয়েল দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। ধবধবে সাদা বিছানার মাঝখানে সবুজ শাড়ির সরল রেখা। মৃন্ময়ী দরজা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিচু গলায় ডাকল, মা ঘুমাচ্ছ?

শায়লা বললেন, আগে দরজা বন্ধ কর। আলো আসছে। চোখে আলো লাগছে।

মৃন্ময়ী বলল, আমি তোমার ঘরে ঢুকব না মা। তোমার ঘরে ঢুকলে মনে হয় অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেছি। তোমার শরীর এখন কেমন?

নিচেরটা পঁচানব্বই।

পালস কত?

পালস নেমে গেছে।

মা শোন, আমি পরশু দিন ঠিকমতোই পরীক্ষা দেব। তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বস।

শায়লা চোখ থেকে টাওয়েল সরিয়ে উঠে বসলেন। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, তুই এ-রকম পাগলামি করিস কেন?

কেন করি জানি না মা।

কাছে এসে একটু বস তো।

মৃন্ময়ী মা'র পাশে এসে বসল। শায়লা বললেন, সকালে নাশতা খাবার সময় তোর বাবাকে কেমন দেখলি?

ভালোই তো দেখলাম।

নরম্যাল দেখেছিস?

হুঁ। অ্যাবনরম্যাল দেখার কথা?

তোর বাবা টাকা-পয়সার বিরাট ঝামেলায় পড়েছে। ব্যাংক-লোনের কী জানি সমস্যা। আমাকে খোলাখুলি কিছু বলছে না।

বাবার কোনোকিছু নিয়ে তুমি শুধুশুধু দুশ্চিন্তা করবে না। বাবার মাথার উপর দাদাজান আছেন। দ্য গ্রেট মিস্টার মুশকিল আসান। এখন আমাকে বিশটা ঘুমের ট্যাবলেট দাও।

কেন?

ভয় নেই খাব না। তুমি ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়া মেয়ে, আমি না।

তুই কেমন মেয়ে?

আমি তোমার মতো পুতুপুতু না, বাবার মতো রঙিন ফানুসও না। আমি আলাদা।

তুই বিয়ে করবি কবে?

কাউকে মনে ধরছে না। যেদিন কাউকে মনে ধরবে ধুম করে বিয়ে করে ফেলব। মা আমাকে ঘুমের ট্যাবলেট দাও।

ওষুধের বাক্স থেকে নে। নীল রঙের ট্যাবলেটগুলি ঘুমের।

মৃন্ময়ী ঘুমের ট্যাবলেট নিয়ে নিজের ঘরে ফিরল। বিন্তি কফির মগ-হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

মৃন্ময়ী বলল, কফি খাব না। বিন্তি মগটা আছাড়া দিয়ে ভেঙে ফ্যাল। হা করে তাকিয়ে থাকবে না। যা করতে বলছি কর।

বিন্তি মগ ভাঙল।

মগ ভাঙার দশ মিনিটের মাথায় ছন্দা ঘরে ঢুকল। সে চোখ কপালে তুলে বলল, ব্যাপার কী রে? এ কী অবস্থা! হয়েছে কী?

মৃন্ময়ী ফোঁপানোর মতো করে বলল, বিন্তি তুমি সামনে থেকে যাও।

বিন্তি পালিয়ে বাঁচল। কি সব জটিল কাণ্ডকারখানা শুরু হয়েছে। এখানে না থাকতে পারাই ভাগ্যের ব্যাপার।

মৃন্ময়ী বলল, ছন্দা তুই আমাকে একটু সাহস দিবি? আমি বিশটা ঘুমের ট্যাবলেট হাতে নিয়ে বসে আছি। সাহসে কুলাচ্ছে না বলে খেতে পারছি না। মৃন্ময়ী হাতের মুঠা খুলে ঘুমের ট্যাবলেটগুলি দেখাল।

ছন্দা হতভম্ব গলায় বলল, Oh my God!

মৃন্ময়ী বলল, কেন আমাকে মরতে হচ্ছে সেটা আমি একটা কাগজে চিঠি লিখে গেছি। কাগজটা আমার টেবিলের ড্রয়ারে আছে। পুলিশি কোনো হাঙ্গামা যদি হয় তুই কাগজটা বের করে পুলিশের হাতে দিবি।

আমি একটু পড়ে দেখি?

মৃন্ময়ী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আচ্ছা পড়ে দেখ। কেউ যেন চিঠির বিষয়ে কিছু না জানে।

গড প্রমিজ কেউ কিছু জানাবে না। আমি মরে গেলেও কাউকে কিছু বলব না।

প্রমিজ।

প্রমিজ।

ক্রস মাই হার্ট।

ক্রস মাই হার্ট।

মৃন্ময়ী ড্রয়ার খুলে খাম এনে ছন্দার হাতে দিল। ছন্দা চোখ বড় বড় করে পড়ল। কাগজের মাঝামাঝি সবুজ কালিতে একটা লাইন লেখা—

আমার মৃত্যুর জন্য আমার প্রিয় বান্ধবী ছন্দা দায়ী।
পুলিশ ইচ্ছা করলে তাকে ধরতে পারে।
সাত দিনের রিমান্ডেও নিতে পারে।

ছন্দা বলল, এর মানে কী?

মৃন্ময়ী বলল, এর মানে ঠাট্টা।

ছন্দা বলল, কোনটা ঠাট্টা?

মৃন্ময়ী বলল, সবটাই ঠাট্টা। ঘুম ভেঙে তোকে দেখতে ইচ্ছা করল। তখন এই আইডিয়া মাথায় এসেছে। গতরাতে তোকে নিয়ে বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে আমরা দু'জন নৌকায় করে গ্রামের এক হাটে উপস্থিত হয়েছি। হাটভর্তি মানুষ। আমাদের নৌকা পাড়ে ভিড়তেই হাট ভেঙে সবাই পাড়ে উপস্থিত। বিরাট হইচই। কারণ আমাদের দু'জনের কারও গায়েই কিছু নেই। একটা সুতা পর্যন্ত না।

ছন্দা বলল, স্বপ্নটা এইমাত্র তুই বানিয়েছিস। ঠিক না?

মৃন্ময়ী বলল, হ্যাঁ।

তোর প্র্যাকটিক্যাল জোকস, পাগলামি— এইসব আমি নিতে পারি না। আমি উঠলাম।

বেশি রাগ করেছিস?

না।

ছন্দা প্রায় ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল। ফিরেও এল ঝড়ের বেগে। বিছানায় ব্যাগ ছুড়ে ফেলে বলল, দুপুরে তোর সঙ্গে খাব। তোদের ঐ বাবুর্চিটা আছে না? রহিমার মা। তাকে রূপচান্দার শুঁটকি রান্না করতে বল। একবার খেয়েছিলাম তার স্বাদ মুখে লেগে আছে।

মৃন্ময়ী বলল, রূপচান্দা শুঁটকি ছাড়া আর কী খাবি?

কইমাছের ঝোল। আর টকের একটা আইটেম রান্না করতে বল তো! টক খেতে ইচ্ছা করছে।

ওকি ডকি। শুঁটকি, কইমাছ, টকের আইটেম পাশ।

নতুন একটা মেয়ে দেখলাম। তোর কাজের মেয়ে?

হুঁ।

চেহারা সুন্দর তো! নাম কী?

নাম বিন্তি। ওর মায়ের নাম শাহেরা, সৎমায়ের নাম চিন্নাই বিবি। বোনের নাম মিন্তি। শুধু বাবার নামটা জানি না। বাবা বিন্তি মিন্তি দুই মেয়েকে মায়ের ঘাড়ে ফেলে আলাদা সংসার করেছে বলে এই ব্যাটার নাম জিজ্ঞেস করি নি।

ছন্দা বলল, আমার দেখা অতি অদ্ভুত কয়েকটি মেয়ের মধ্যে তুই একটা।

মৃন্ময়ী বলল, তুই অতি অদ্ভুত মেয়ে একটাই দেখেছিস। আমি। আমি ছাড়া আরেক জনের নাম কিন্তু তুই বলতে পারবি না।

পারব।

তা হলে বল। ত্রিশ সেকেন্ড সময়।

মনে করতে সময় লাগবে না?

মৃন্ময়ীর ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। শাহেদুর রহমান সাহেবের অ্যাসিসটেন্ট ফরিদ হোসেন চাপা গলায় বলল, আপা আমি ফরিদ।

মৃন্ময়ী বলল, ফরিদ আপনি কী চান?

বড় সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন।

সেটা তো বুঝতেই পারছি। কীজন্যে পাঠিয়েছেন?

আপনার বান্ধবী ছন্দাকে তিনি দেখা করতে বলেছেন। তাকে কী-একটা ছবি দেখাবেন।

মৃন্ময়ী বলল, একটু দেরি হবে, আমরা গল্প করছি।

ছন্দা বলল, দেরি হবে না। আমি এখুনি যাচ্ছি। তুই এর মধ্যে ঘর গুছিয়ে নে। নোংরা ঘরে বসতে পারব না।

মৃন্ময়ী বিছানায় শুয়ে পড়ল। ছন্দা সহজে ছাড়া পাবে না। শুয়ে শুয়ে থার্মোডিনামিক্সের চ্যাপ্টারটার উপর চোখ বুলানো যায়। এনট্রপির সঙ্গে ক্যাওসের বিষয়টা মাথায় নিয়ে নেয়া। ইচ্ছা করছে না। তারচে বরং জর্জিয়ান চেন্ট কিছুক্ষণ শুনা যায়। শিয়ালের হুক্কা হুয়া।

ছন্দা শাহেদুর রহমানের সামনে বেতের চেয়ারে বসে আছে। সে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। শাহেদুর রহমানের হাতে দেড় ফুট বাই দেড় ফুট একটা ওয়াটার কালার। ছবিতে দেখা যাচ্ছে---- পুকুরঘাটে পানিতে পা ডুবিয়ে একটি কিশোরী মেয়ে বসে আছে।

শাহেদুর রহমান বললেন, ছবিটা কেমন মা?

ছন্দা বলল, অসাধারণ।

ছবিটা দেখে যামিনি রায়ের কথা মনে হয় না?

যামিনী রায়ের নাম ছন্দা শুনে নি তারপরেও সে বলল, হুঁ হয়।

সেই তুলির টান, সেই রং এর ব্যবহার। ঠিক না?

জি।

পানিতে মেয়েটার যে রিফ্লেকশন সেদিকে তাকাও। আলো-ছায়ার খেলাটা দেখ। অপূর্ব না?

জি।

ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে পুরানো ঘাটের শ্যাওলার গন্ধ পর্যন্ত পাবে।

ছবিটা কার আঁকা?

নাম করা কেউ না। জহির নাম। ইয়াং ছেলে। আমি এক্সিবিশন থেকে কিনেছি। ওর আঁকা একটা ছবিই ছিল। আরও থাকলে আরও কিনতাম।

কত দিয়ে কিনেছেন?

দশ হাজার টাকা।

কী আশ্চর্য এত টাকা!

শাহেদুর রহমান বললেন, মা'রে! ছবির বাজারে দশ হাজার টাকা কোনো টাকাই না। এস এম সুলতানের ওয়াটার কালার দুই লাখ টাকার নিচে পাবে না। জয়নুলের উডকাট কয়েক দিন আগে কিনেছি তিন লাখ পচাত্তর হাজার টাকায়।

কী বলেন চাচা!

শাহেদুর রহমান আনন্দের হাসি হাসলেন।

ছন্দা বলল, চাচা আপনি নিজে ছবি আঁকা ধরেন তো। অন্যের ছবি কেন কিনবেন। নিজে এঁকে ঘরে সাজিয়ে রাখবেন। দু'-একটা ছবি আমরাও উপহার হিসেবে পাব।

শাহেদুর রহমানের আনন্দ আরো বাড়ল। এই মেয়েটা তাঁর মনের কথা বলেছে। তিনি অনেক দিন থেকেই ভাবছেন ছবি আঁকা শিখবেন। ক্রিয়েটিভ

কাজে বয়স কোনো ফ্যাক্টর না। Even an old dog can learn few new tricks. বৃদ্ধ কুকুরও কয়েকটা নতুন খেলা শিখতে পারে। জহির ছেলেটার ঠিকানা জোগাড় করা হয়েছে। সপ্তাহে তিন দিন সে যদি আসে মন্দ কি!

ছন্দা বলল, চাচা আমি যাই। মৃন্ময়ী অপেক্ষা করছে।

শাহেদুর রহমান বললেন, পাঁচটা মিনিট বোস। আমার সঙ্গে চা খাও। ফরিদকে চা দিতে বলি। চা খেতে খেতে আরো কিছু ছবি দেখ। শুধুমাত্র একটা রঙ দিয়ে আঁকা ছবির নমুনা দেখাব। আর্টিস্ট লেমন ইয়োলোর নানান শেড ব্যবহার করে কী জিনিশ যে তৈরি করেছেন! ছবি দেখলে মনে হয় সাত রঙের খেলা। আসলে একটা সাত রঙ লেমন ইয়েলো।

মৃন্ময়ী শেয়ালের ডাক শুনেই যাচ্ছে। বিন্তি অতি দ্রুত ঘর গুছিয়ে ফেলেছে। মেঝেতে কফির দাগ বসে গেছে। সে এখন দাগ উঠানোর জন্যে ভিজল দিয়ে মেঝে ঘসছে।

মৃন্ময়ী সিডি বন্ধ করে হাতের ইশারায় বিন্তিকে ডাকল। বিন্তি অবাক হয়ে কাছে এগিয়ে এল। ঘরে সে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। তাকে কিছু বলতে হলে হাতে ইশারা করে কাছে ডাকতে হবে না।

আমার বান্ধবী ছন্দাকে তোমার কেমন লাগল?

বিন্তি বলল, ভালো।

ও দেখতে কেমন?

খুব সুন্দর।

আমার মতো?

আপনার মতো না। আপনার চেয়ে অনেক কম কিন্তু সুন্দর।

মৃন্ময়ী বলল, দশের মধ্যে নাম্বার দাও। দশে আমাকে কত দেবে আর ছন্দাকে কত দেবে।

বিন্তি চুপ করে আছে। কি বলবে সে? আপার যত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন।

মৃন্ময়ী বলল, ঝিম ধরে থাকবে না উত্তর দাও।

বিন্তি বলল, আপনি দশে নয় আর ঐ আপা সাত।

মৃন্ময়ী বলল, আমি দশে দশ না কী জন্য? আমি এক পয়েন্ট কম কেন পেয়েছি? তুমি কি দশে দশ কোনো মেয়ে এর আগে দেখেছ?

জি না।

তাহলে তোমার স্ট্যান্ডার্ডটা কী? পয়েন্ট দিতে হলে একটা স্ট্যান্ডার্ড লাগে।

হুট করে পয়েন্ট দেয়া যায় না।

মৃন্ময়ী নাকে হাত দিয়ে নাকফুল খুলছে। নাকফুলটা হীরার। ওয়ান ফোর্থ ক্যারেট। শাহেদুর রহমান স্পেন থেকে তার মেয়ের জন্যে কিনে এনেছিলেন।

বিন্তি আমার এই নাকফুলটা তুমি বাথরুমের বেসিনে সোপকেসের পাশে রেখে আস। এমনভাবে রাখবে যেন হাত-মুখ ধুতে গেলেই চোখে পড়ে। আমার বান্ধবী ছন্দা চোর স্বভাবের মেয়ে। আমি দেখতে চাই সে নাকফুলটা চুরি করে কি-না। হা করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে না। আমি হা করে তাকিয়ে থাকার মতো কোনো কথা বলিনি।

বিন্তি নাকফুল নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। মৃন্ময়ী আবারও শিয়ালসংগীত চালু করল।

কথা ছিল ছন্দা দুপুর পর্যন্ত থাকবে। দুপুরে রূপচান্দা শুঁটকি দিয়ে ভাত খাবে। হঠাৎ সে মত বদলালো। দুপুরে খাবে না। অনেক পড়া বাকি। বাসায় চলে যাবে।

ছন্দা বলল, তোদের গাড়ি কি আমাকে একটু নামিয়ে দিতে পারবে?

মৃন্ময়ী বলল, অবশ্যই পারবে।

তাহলে দেখা হবে পরীক্ষার হলে।

ছন্দা চলে যাবার পরেই মৃন্ময়ী বলল, বিন্তি দেখ তো বাথরুমে আমার নাক ফুলটা আছে কি-না।

বিন্তি বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, নাই আফা।

মৃন্ময়ী হাই তুলতে তুলতে বলল, জানতাম পাওয়া যাবে না।

আপা এখন কী 'হইব'?

মৃন্ময়ী বলল, 'হইব' আবার কি? বল 'হবে'। প্রশ্নটা ঠিকমতো আরেক বার কর।

আপা এখন কী হবে?

কিছুই হবে না। কি আর হবে? টেলিফোনটা দাও। বিন্তি টেলিফোন এনে দিল। তার হাত-পা কাঁপছে। কী ভয়ংকর ঘটনা অথচ আপা কত স্বাভাবিক যেন কিছুই হয় নি।

হ্যালো ছন্দা।

হ্যাঁ! আবার কোনো ঘটনা ঘটিয়েছিস? তোর টেলিফোন পেলেই বুকে ধাক্কার মতো লাগে। বল কী ঘটিয়েছিস?

আমি কিছু ঘটাইনি। আমার কাজের মেয়েটা ঘটিয়েছে। বাথরুমে বেসিনের উপর আমার নাকফুলটা রেখেছিলাম। এখন দেখি নেই। হীরের নাক ফুল।

বলিস কি! এই মেয়ে কতদিন ধরে আছে?

সপ্তাহখানেক হবে।

রেফারেন্স আছে, না রেফারেন্স ছাড়া রেখে দিয়েছিস?

জানি না রেফারেন্স আছে কি-না। ম্যানেজার সাহেব জানেন।

ওকে ভালো করে সার্চ কর। ওর জিনিসপত্র দেখ। ওকে একা সার্চ করলে হবে না, তোদের বাড়িতে ওয়ার্কিং ক্লাস যারা আছে সবাইকে সার্চ কর। ওদের মধ্যে এক ধরনের আন্ডারস্ট্যানডিং থাকে। একজন চুরি করে অন্যজন লুকিয়ে রাখে।

ভালো বুদ্ধি।

পুলিশের ভয় দেখিয়ে দেখ। নতুন এসেছে তো পুলিশ-ভীতি থাকবে।

পুলিশের ভয় দেখানো যেতে পারে। মেয়েটা কি রকম বদ শোন, আমাকে বলছে নাকফুলটা নাকি তুই নিয়েছিস।

কী!

সে কসম কেটে বলছে। এই শ্রেণী তো আবার কীরা-কসম কাটতে ওস্তাদ।

আমার কথা বলছে! মৃন্ময়ী লজায় আমার তো মরে যেতে ইচ্ছা করছে। ছিঃ ছিঃ! সে দেখলো কিভাবে আমি নিয়েছি? একবার বাথরুমে গিয়েছি। দরজা ছিল বন্ধ।

মৃন্ময়ী বলল, সে বলেছে সে কিছুই দেখে নি।

তাহলে?

বিন্তি বলছে তুই এ-বাড়িতে আসার পর সে বাথরুমে ঢুকে নি। তুই ছাড়া এটা না-কি কেউ নিতেই পারে না। তার লজিকও ফেলে দিতে পারছি না।

ছন্দা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কী বললি! মৃন্ময়ী তুই কী বললি!

মৃন্ময়ী বলল, তুই নাকফুলটা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে দে।

আমাকে এ রকম একটা কথা তুই বলতে পারলি? Of all persons you?

মৃন্ময়ী হেসে ফেলে বলল, ঠাট্টা করছি।

ছন্দা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ঠাট্টা?

মৃন্ময়ী বলল, হ্যাঁ ঠাট্টা। আচ্ছা তুই ঠাট্টা নিতে পারিস না কেন? আমি ঠাট্টা করতে পারব না?

ছন্দা বলল, আমি আসলেই এ ধরনের ঠাট্টা নিতে পারি না। আমি তোর

কাছে আর কোনোদিন আসব না প্রমিজ।

মৃন্ময়ী খিলখিল করে হাসছে। তার পাশে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে বিন্তি। এই বড়লোকদের ঠাট্টা-তামশার নমুনা? নাকফুল আর উদ্ধার হবে না?

বিন্তি!

জি আপামণি।

ছন্দা আমার অতি প্রিয় বান্ধবী। তাকে আমি খুব পছন্দ করি।

জি আচ্ছা।

মেঝে ঘষাঘসি বন্ধ করে চলে যাও। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি পড়ব। কেউ যেন আমার ঘরে না ঢুকে। দুপুরে আমি শুধু একটা স্যান্ডউইচ খাব। স্যান্ডউইচ তুমি আমার ঘরে দিয়ে যাবে। Now clear out.

বিন্তি ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল।

জহির অনেকক্ষণ হলো বসে আছে। যে ঘরে তাকে বসানো হয়েছে সেটা বসার ঘর না। অতি বিত্তবানদের বসার ঘরে অনেক কায়দা-কানুন থাকে। ইন্টোরিয়ার ডেকোরেটররা কালার চার্ট দেখে ঘর সাজান। হট কালার, কোল্ড কালার, অনেক জটিলতা। এই ঘরে কোনো জটিলতা নেই।

বসার সোফা আছে। সোফার কভার ময়লা। একটা জায়গায় সেলাই খুলে গেছে। কিছু প্লাস্টিকের সস্তা চেয়ারও আছে। ঘরের মাঝখানে লম্বা একটা টেবিল। টেবিল থেকে বার্নিশের গন্ধ আসছে। মনে হচ্ছে টেবিলটা বার্নিশ করা হচ্ছে। বার্নিশমিস্ত্রী এখনও আসে নি। এলেই কাজ শুরু হবে।

দেয়ালে গত বৎসরের একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। অতি বিত্তবানদের ঘরে ক্যালেন্ডার থাকে না। এদের আছে কেন বুঝা যাচ্ছে না। কাছেই মনে হয় রান্নাঘর। ভাজাভুজির গন্ধ আসছে।

সোফা থাকা সত্ত্বেও জহিরকে বসানো হয়েছে প্লাস্টিকের চেয়ারে। জহিরের গালের খোচাখোচা দাড়ি— এর কারণ হতে পারে। যে পাঞ্জাবিটা তার গায়ে সেটা সে গত দুদিন ধরেই পরে আছে। পাঞ্জাবি থেকে ঘামের গন্ধ আসার কথা। প্যান্টটা অবশ্যি ইস্ত্রি করা। পায়ের স্যান্ডেলের অবস্থাও ভালো। তারপরেও জহিরের ধারণা তার চেহারায় সাহায্যপ্রার্থী ভাব কোনো-না-কোনোভাবে এসে গেছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কেউ সোফায় বসায় না। তার জন্যে বেতের মোড়া খোঁজা হয়।

যে ভদ্রলোক জহিরকে বসিয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেছেন তার আচার-আচরণ অবশ্যি ভালো। চেহারায় কোমলতা আছে। বিনয়ী কথাবার্তা। বড়লোকদের মাঝে মাঝে বিনয়ী হতে দেখা যায় কিন্তু বড়লোকদের বাড়ির কাজের লোকদের মধ্যে এই জিনিস নেই। জহির তাকে বলেছে— স্যারকে আমার নামটা বলবেন। নাম বললেই চিনবেন। আমার নাম জহির। বলবেন আর্টিস্ট জহির।

ভদ্রলোক বললেন, (হাসি মুখে) আপনার কি কোনো কার্ড আছে?

আমার কোনো কার্ড নেই। স্যার আমাকে বলেছিলেন যে-কোনো একদিন চলে আসতে। এপয়েন্টমেন্ট লাগবে না। উনি আমার একটা ছবি কিনেছিলেন। আমি নতুন ছবি নিয়ে এসেছি।

স্যার খুবই জরুরি কিছু কাজ করছেন। ব্যাংকের কাজ। একটু দেরি হবে।

দেরি হলে সমস্যা নেই।

চা খাবেন?

চা খেতে পারি।

চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক উধাও হয়েছেন পনোরো মিনিট আগে।

চা এখনো আসে নি। জহির সিগারেট ধরালো। তার আগে দেখে নিল সোফায় পাশের সাইড টেবিলে এসট্রে আছে। এসট্রেতে বেশ কিছু সিগারেটের শেষ অংশ। সে প্লাস্টিকের চেয়ার ছেড়ে সোফায় বসল। সিগারেট হাতে এসট্রের কাছাকাছি বসাই যুক্তিযুক্ত।

জহিরের হাতে রোল করা তিনটা ওয়াটার কালার। এর যে-কোনো একটা আজ দিনের মধ্যে বিক্রি করতে হবে। তিনটা ছবিই খাস্তা। জহির নিশ্চিত ভদ্রলোক এটা ধরতে পারবেন না। তিনটি ছবিতেই লোক-ভুলানো ব্যাপার আছে। ধবল বকের ছবি। গাঢ় রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে বকপাখির ধবল রঙ তুলে আনা হয়েছে। দেখতে ভালো লাগে এই পর্যন্তই। মনে কোনো ছাপ পড়ে না। ছবিতে গল্প নেই। রঙের কারিগরি আছে। চোখকে ফাঁকি দেয়ার ব্যাপার আছে। এর বেশি কিছু না।

চা নিয়ে একজন ঢুকেছে। আলাদা প্লেটে সমুচা জাতীয় কিছু। বড় লোকদের বাড়ির চা সব সময় ঠাণ্ডা হয়। অভাজনদের জন্যে তারা হেলাফেলা করে চা বানায়। দুধ নিতে সময় নেয়, চিনি দিতে সময় নেয়, চামচ নাড়তে সময় নেয়। এর মধ্যে চা হয়ে যায় পানি। মুখে নিয়েই থু করে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে।

ঠাণ্ডা চা মনে করে চুমুক দিয়ে জহিরের মুখ পুড়ে গেল। আগুন-গরম চা। তবে চা-টা হয়েছে ভালো। চায়ের পাতা যে দামি বুঝা যাচ্ছে। চমৎকার গন্ধ আসছে। হতে পারে সরাসরি বাগান থেকে আনা চা। এদের হয়তো কয়েকটা বাগান আছে। বনেদী ধনি।

বনেদী ধনিরা সহজে পয়সা বের করতে চায় না। নতুন যারা ধনি হচ্ছে তাদের খরচের হাত ভালো থাকে। নব্য ধনীরা তিনটা ছবিই কিনে ফেলবে। তাদের থাকে জমা করার নেশা। যা দেখবে তাই কিনে জমাবে। কি জমাচ্ছে তা

নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।

আসুন। স্যার ফ্রী হয়েছেন। চার তলায় যেতে হবে। স্যার চারতলায় বসেন।

লিফট আছে না?

লিফট নেই।

এমন জমকালো চারতলা বাড়ি! লিফট নেই এটা কেমন কথা?

বাড়িটা স্যারের বাবার বানানো। উনি লিফট পছন্দ করেন না। একবার লিফটে চার ঘণ্টা আটকা পড়েছিলেন সেই থেকে উনার লিফট-ভীতি। উনি যে কয়টা বাড়ি বানিয়েছেন কোনোটার লিফট নেই।

আপনার স্যারের কি চায়ের বাগান আছে?

স্যারের চায়ের বাগান নেই। উনার বাবার আছে। পুরোটা না শেয়ারে। বাগান বিক্রি হয়ে যাবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে।

আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?

আমি স্যারের এসিসটেন্ট, কাম ম্যানেজার।

আপনাকে তো অনেকবার উপর-নিচ করতে হয়।

জি। অবস্থা কাহিল। কি করব চাকরি।

আপনার নামটা জানা হলো না।

আমার নাম ফরিদ। ফরিদ হোসেন।

জহির বলল, আমার নাম তো আপনাকে একবার বলেছি। আবার কি বলব?

ফরিদ বলল, না বলতে হবে না। আপনার নাম আমার মনে আছে। জহির। আর্টিস্ট জহির। ছোটবেলায় আমি ভালো আর্ট করতে পারতাম। এখনও হাতী, বাঘ এইসব আঁকতে পারি।

ভেরি গুড।

আপনার উঠতে কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। আমার অবস্থা চিন্তা করেন। দিনের মধ্যে সতেরো-আঠারো বার উঠা নামা করি। আপনাকে যেই স্যারের কাছে হাওলা করে দিব। স্যার সঙ্গে সঙ্গে বলবেন চা আন। আবার নিচে যাও।

উপরে চায়ের ব্যবস্থা নাই?

জি না। কিচেন এক তলায়। স্যার ধোয়ার গন্ধ সহ্য করতে পারেন না বলে উপরে কিচেন নেই। ঝামেলা আর কারোর না, আমার। একবার হিসাব করেছিলাম সারাদিনে আঠারো বার উঠা-নামা করেছি। ঐটাই আমার রেকর্ড।

আজ দিনে এখন পর্যন্ত কতবার উঠানামা করলেন।

আজকেরটার হিসাব নাই।

জহিরের মনে হলো ম্যানেজার ছেলেটা শুধু যে ভালো তা-না। বেশ ভালো।

শাহেদুর রহমান আনন্দিত গলায় বললেন, হ্যালো জহির। কেমন আছ?

স্যার ভালো আছি। তিনটা ছবি আপনার জন্য এনেছি। দেখেন পছন্দ হয় কি না।

ওয়াটার কালার?

জি, ওয়েল কালার করব কিভাবে? রঙই কিনতে পারি না, রং, বোর্ড।

রঙ কেনার টাকার টানাটানি হলে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাবে। নো প্রবলেম।

স্যার থ্যাংক ইউ। ছবিগুলি কি দেখাব?

আগে চা খেয়ে নেই। তারপর না ছবি। ফরিদ চা আন।

জহির ফরিদের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, স্যার আমার চা না হলেও চলবে। চা খেয়ে এসেছি।

আরেকবার খাও। ফরিদ! দাঁড়িয়ে আছ কেন? চা দিতে বললাম না।

ফরিদ ছুটে বের হয়ে গেল।

শাহেদুর রহমানের তিনটা ছবিই পছন্দ হলো। জহির বলল, বক পাখি নিয়ে একটা সিরিজের মতো করেছি। বিভিন্ন সময়ে উড়ে যাওয়া বকের ছবি। সিরিজের নাম দিয়েছি 'উড়ে যায় বকপক্ষী'।

নামও তো সুন্দর। তুমি তোমার এই সিরিজের কোনো ছবি আমাকে না দেখিয়ে বিক্রি করবে না।

অবশ্যই না।

তিনটা ছবির জন্যে তোমাকে কত দেব বল তো?

জহির অতি দ্রুত চিন্তা করছে। দাম বেশি চেয়ে ফেললে এই শিল্পবোদ্ধা হয়তো বলে বসবে কিনব না। একবার একটা দাম বলে ফেললে দাম কমানোও যায় না। ছবিতো আর মাছ না যে দাম নিয়ে মুলামুলি চলবে। জহিরের আপাতত পনেরো হাজার টাকা হলেই চলবে। বাড়ি ভাড়ার চার হাজার, মুদির দোকানের দুই হাজার। ফজলুর কাছে ধার আছে চার হাজার, পুরোটা না দিলেও চলবে অর্ধেক তো দিতে হবে। ছোট বোন তার মেয়ে আর স্বামী নিয়ে খুলনা থেকে বেড়াতে এসেছে। তিন-চার দিন থাকবে। জন্মের পর ভাগ্নিকে জহির এই প্রথম দেখবে, তাকে একটা-কিছু দিতে হবে। সোনার আংটি বা চেইন। সোনার ভরি

এখন কত কে জানে।

শাহেদুর রহমান বললেন, কী ব্যাপার কিছু বলছ না কেন?

জহির বলল, স্যার আপনি যা দেবেন তাই আমি নেব।

ত্রিশ হাজার দিলে চলবে? পার পিস দশ?

স্যার আমি তো আগেই বলেছি। আপনি যা দেবেন আমি তা-ই নেব। আপনি যদি বলতেন, জহির আমি তোমাকে কিছুই দেব না। তুমি তিনটা ছবি রেখে যাও। আমি ছবি রেখে হাসিমুখে চলে যেতাম। আপনি মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

বিশ্বাস করছি। কেন বিশ্বাস করব না।

শাহেদুর রহমান আনন্দিত গলায় বললেন, আমার কাছে শুধু ছবি বিক্রি করলে হবে না। আমাকে তুমি ছবি আঁকা শেখাবে।

অবশ্যই স্যার।

সপ্তাহে তিন দিন তুমি আমাকে শেখাবে। তার জন্যে তোমাকে যথাযত সম্মানী দেয়া হবে।

সম্মানীর কথা বলে আপনি আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনাকে যদি ছবি আঁকা শেখাতে পারি সেটাই হবে আমার সম্মানী।

তুমি পোর্ট্রেট করতে পার?

পারি।

আমার বাবার, আমার এবং আমার মেয়ে মৃন্ময়ী এই তিনজনের তিনটা পোর্ট্রেট করে দেবে। প্রথমে মৃন্ময়ীরটা কর। আমার মেয়ের সঙ্গে কি তোমার পরিচয় হয়েছে?

জি না।

খুবই শার্প মেয়ে। আমি চাই মনের শার্পনেসটা যেন ছবিতে আসে।

চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না স্যার।

চা চলে এসেছে। চা'র সঙ্গে সকালের সেই সমুচা। বাড়তি হিসেবে আছে কেক। বুঝাই যাচ্ছে দামী কেক। জহির কেক খেয়ে আরাম পাচ্ছে না। তার টেনশান একটাই— এই লোক পেমেন্টটা চেকে করবে না তো। চেকে করলে সাড়ে সর্বনাশ। একটা বেজে গেছে ব্যাংক বন্ধ। ঘরে আছে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট। চাল-ডাল সবই কিনতে হবে। বাড়িতে মেহমান। প্রায় চার বছর পর ছোট বোনের সঙ্গে দেখা।

শাহেদুর রহমান সাহেব চেকে পেমেন্ট করলেন। এই কাজটা যে উনি করবেন তার আগেই বুঝা উচিত ছিল। বড় লোকরা বাসায় নগদ টাকা রাখে না বললেই হয়। তাদের আছে ক্রেডিট কার্ড। একশ পাতার মোটা মোটা চেক বই।

জহির চারতলা থেকে এক তলায় নেমেছে। ফরিদ তার সঙ্গে আছে। জহির বুঝতে পারছে না ফরিদকে তার সমস্যার কথা খুলে বলবে কি বলবে না। সব মানুষ নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত, অন্যের সমস্যা তারা বুঝতে পারে না।

ফরিদ সাহেব।

জি।

আমার ছোট্ট একটা প্রবলেম আপনি সমাধান করতে পারবেন কি-না বুঝতে পারছি না। আপনার চেহারা দেখে মনে হয় আপনি কাইন্ড হার্টেড লোক।

বলুন কি সমস্যা।

স্যার চেক দিয়েছেন। আমার দরকার নগদ টাকা।

চেক কাল ভাঙ্গাতে পারবেন। ক্রশ চেক তো না। বাংকে জমা দিলেই টাকা পেয়ে যাবেন।

জহির বলল, আজকের দিনটা কীভাবে পার করব? আমার ছোটবোন তার মেয়ে নিয়ে খুলনা থেকে বেড়াতে এসেছে। মেয়ের দুধ আর কি কি যেন কিনতে হবে লিস্ট দিয়ে দিয়েছে। বাড়িওয়ালার বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে তিন মাসের। আজ সন্ধ্যার মধ্যে কিছু-না-কিছু দিয়ে তাকে সামলাতে হবে। না হলে আত্মীয়স্বজনের সামনে অপমান করে ছাড়বে।

ফরিদ বলল, বুঝতে পারছি।

জহির বলল, বুঝতে পারছেন না। সমস্যা আপনাকে পুরোটা বলি নি। এখনও বাকি। ভাই কোনো ব্যবস্থা কি করা যায়?

আপাকে বলে দেখতে পারি। উনার কাছে ক্যাশ থাকে।

আপা কে?

স্যারের মেয়ে মৃন্ময়ী।

আপনি কি গুছিয়ে বলতে পারবেন? না-কি আমি বলব? বরং একটা কাজ করুন উনাকে বলুন জহির নামের একজন আর্টিস্ট কয়েক মিনিট কথা বলতে চায়। বলতে পারবেন না?

পারব।

জহির আবার আগের জায়গায় বসে আছে। সোফায় না, প্লাস্টিকের চেয়ারে। তার সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা করছে ধরাচ্ছে না। সিগারেট ধরালে গায়ে সিগারেটের গন্ধ লেগে থাকবে। মেয়েরা প্রেমিকদের গায়ে সিগারেটের গন্ধ সহ্য

করে অন্যদেরটা করে না। সে পকেট থেকে মীনা'র দেয়া লিস্ট বের করল। লিস্টে এত কিছু লেখা এই প্রথম দেখল :

দুধ— নেসলে এক কৌটা
হট ওয়াটার ব্যাগ
ডায়াপার (তিন বছরের)
এক কেজি কাল রঙের মিষ্টি
(টুনটুনি কালো মিষ্টি ছাড়া খায় না)
অলিভ ওয়েল
বেবি শ্যাম্পু

ফরিদকে আসতে দেখা যাচ্ছে। তার পেছনে কোনো নারীমূর্তি নেই। মৃন্ময়ী নামের তরুণী মনে হয় অপরিচিত কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

জহির সাহেব। আপার ঘরের দরজা বন্ধ। উনার সঙ্গে কথা বলতে পারি নাই।

দরজা নিশ্চয়ই খুলবে। খুলবে না?

জি। সারা দিন তো আর দরজা বন্ধ করে রাখবেন না।

তাহলে অপেক্ষা করি।

জি আচ্ছা! আপনার তো মনে হয় টাকার খুবই প্রয়োজন। আমার কাছে এক হাজার টাকা আছে। ইচ্ছা করলে নিতে পারেন।

আপার কাছ থেকে সুবিধা না হলে আপনার কাছ থেকে টাকাটা নিতে হবে। খালি হাতে আজ ফেরাই যাবে না। ভাই আপনি মাঝে মাঝে খোঁজ নেবেন আপা দরজা খুলেছে কি-না। উনার মেজাজ কেমন?

ভালো।

বুদ্ধি কেমন?

বুদ্ধিও ভালো।

আপনার স্যারের চেয়ে বেশি না কম?

বেশি। উনার বুদ্ধি স্যারের বাবার মতো। তবে স্যারের বাবা গরম মাথার মানুষ। আপা ঠাণ্ডা মাথার।

চেহারা কেমন? আর্টিস্ট মানুষ তো, চেহারা কেমন জানতে হয়। উনার পোর্ট্রেট করতে হবে।

চেহারা খুবই সুন্দর। আমি আমার জীবনে এত রূপবতী মেয়ে দেখি নাই।

বলেন কি!

টেলিভিশনে দেখি বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়। দুনিয়ার মেয়ে লাইন করে দাঁড়ায়। মৃন্ময়ী আপার কাছে এরা কিছুই না। এরা উনার নখের কাছেই আসতে পারবে না।

আপনি তো মনে হয় উনার প্রেমে পড়ে গেছেন।

আরে না। কী যে বলেন! ছিঃ!

ছিঃ! বলেন কেন? কত গল্প আছে বড় লোকের মেয়ে গাড়ির ড্রাইভারের প্রেমে পড়ে গৃহত্যাগ করেছে। আপনার পজিসন তো ড্রাইভারের চেয়ে উপরে। ভাই যান তো আরেক বার খোঁজ নিয়ে আসুন। দেখে আসুন বিশ্বসুন্দরী আপা দরজা খুলেছেন কি-না।

ফরিদ চলে গেল। জহির ঘড়ি দেখল। দু'টা দশ। সে বাসায় দুপুরের কোনো খাবারের ব্যবস্থা করে আসে নি। চাল-ডাল অবশ্যি আছে। মীনা বুদ্ধি করে কিছু কি করে ফেলবে না? ডাল রাঁধল, ভাত ফুটালো, তার স্বামীকে দোকানে পাঠিয়ে এক হালি ডিম আনিয়ে নিল। কষানো ডিম, ডাল, ভাত। সহজ বাঙালি খাবার।

জহির মীনার স্বামীর নাম মনে করার চেষ্টা করছে। নামটা মনে পড়ছে না। দন্ত স দিয়ে নাম। সালাম না তো? সামছু কি? সাবের? স্বাধীন? সেলিম?

ছোট বোনের স্বামীর নাম ভুলে যাওয়া অপরাধের মধ্যে পড়ে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারাও হয়তো আছে।

দন্ডবিধি এত : অপরাধ ছোট বোনের স্বামীর নাম বিস্মরণ।

শাস্তি : ৫০০ টাকা জরিমানা এবং দুই দিনের কারাবাস।

জহির আশায় আশায় আছে কোনো এক ফাঁকে নামটা মনে আসবে তখন সেই নামে ডাকা যাবে। নাম মনে আসছে না। মীনা তাকে ডাকে 'টিয়া'। এই টিয়া কী করছ? বাবুকে ধর। এই টিয়া জানালার পর্দা টেনে দাও।

জহির বলেছিল, টিয়া টিয়া করছিস কেন? ওর নাম কি টিয়া?

মীনা উত্তরে বলল (অভিমানি গলা) ভাইয়া এটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। ও আমাকে ময়নাপাখি ডাকে। আমি উত্তরে টিয়াপাখি ডাকি।

জহির বলল, ও তোকে ময়না ডাকতে পারে তোর গায়ের রঙ কালো। তুই ওকে টিয়া ডাকবি কেন? ওর গায়ের রঙ তো সবুজ না। তুই মর্ডান মেয়েদের মতো স্বামীর নাম ধরে ডাকবি। দেখি আমার সামনে স্বামীকে একবার নাম ধরে

ডাক।

মীনা রাগী গলায় বলল, ওকে সারাজীবন আমি টিয়া ছাড়া কিছু ডাকব না। আরেকটা কথা ভাইয়া তুমি চট করে বলে ফেললে আমার গায়ের রঙ কালো। আমি যদি কালো হই তাহলে ফর্সা কে? তুমিও তো একদিন বিয়ে করবে। দেখব তোমার বউয়ের গায়ের রঙ কি হয়।

জহির বলল, তুই কি কেঁদে ফেলবি না-কি?

তুমি উল্টা-পাল্টা কথা বলবে আমি কাঁদব না।

আপনি জহির!

জহির থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকে মনে মনে বলতেই হলো, কী আশ্চর্য এই মেয়ে কে? যে পুরুষ প্রথম দর্শনেই এই মেয়ের প্রেমে পড়বে না, সে পুরুষই না।

ফরিদ সাহেব আমাকে আপনার সমস্যার কথা বলেছেন। এখানে ত্রিশ হাজার টাকা আছে।

জহির পকেট হাতড়ে চেকটা বের করে এগিয়ে দিল।

মৃন্ময়ী বলল, কি?

ত্রিশ হাজার টাকার চেকটা।

আমাকে চেক দিচ্ছেন কেন? আমি কি ব্যাংক?

ম্যাডাম সরি।

চেক ভাঙ্গিয়ে টাকা ফেরত দিলেই হবে।

কতটুকু উপকার যে আপনি আমার করেছেন সেটা আপনি বুঝতেও পারবেন না। থ্যাংক য়্যু।

মৃন্ময়ী তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁটে চাপা হাসি।

জহির বলল, ম্যাডাম আমি কাল সকালেই আপনার হাতে টাকাটা দিয়ে যাব।

মৃন্ময়ী বলল, আমার হাতেই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ম্যানেজারকে দিলেই চলবে।

জহির বলল, আমি যার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি তার কাছেই দিতে চাই। আপনাকে আরেকবার থ্যাংক য়্যু।

ফরিদ জহিরকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। গেটের কাছে এসে বলল, আপনাকে বলেছিলাম না? বিশ্বসুন্দরী। ভুল বলেছি?

জহির বলল, ভুল বলেন নাই।

ফরিদ বলল, অতিরিক্ত সুন্দরী হওয়া ঠিক না।

জহির বলল, ঠিক না কেন?

সারাক্ষণ মানুষে চোখে লাগায় নানান অসুখ-বিসুখ হয়।

উনার কি প্রায়ই অসুখ-বিসুখ হয়?

তা অবশ্য না।

জহির বলল, ভাই আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি আমার বিরাট উপকার করেছেন। যদি কোনোদিন আমি আপনার কোনো উপকার করতে পারি আমাকে বলবেন। আর আপনার দাওয়াত। একদিন আমার বাড়িতে আসবেন। ডাল-ভাত খাবেন। আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন না আলাদা থাকেন?

এই বাড়িতেই থাকি। স্যারের সঙ্গে থাকি। স্যার যে ঘরে ঘুমান আমি তাঁর পাশের ঘরে ঘুমাই। উনার কখন কি প্রয়োজন হয়। উনার বোবায়-ধরা রোগ আছে। বোবায় ধরলে আমাকে দৌড়ে যেতে হয়। ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাতে হয়।

উনার স্ত্রী উনার সঙ্গে ঘুমান না?

জি না। উনার স্ত্রীর নানান অসুখ-বিসুখ আছে। উনি আলাদা ঘুমান।

জহির বলল, আপনার কি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে?

ফরিদ বলল, অভ্যাস নাই। তবে দিন একটা খাই।

জহির তাকিয়ে আছে, ফরিদ চিন্তিত মুখে সিগারেট টানছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চায়।

জহির বলল, কিছু বলবেন?

ফরিদ থতমত খেয়ে বলল, জি না! জি না! কিছু বলব না।

জহির ঘরে ফিরল বিকাল চারটায়। বেল দিতেই মীনা দরজা খুলল। গম্ভীর গলায় বলল, ভাইয়া ব্যাপারটা কী বল তো? তোমার কাছে বেড়াতে এসে আমরা কি কোনো পাপ করেছি?

পাপ করবি কেন?

কোনো খাবারের ব্যবস্থা নাই, কিছু না।

দুপুরে খাস নি।

কী খাব বল? টিয়া আবার ক্ষিধা সহ্য করতে পারে না। সে দুটা বার্গার কিনে এনেছে। দুজনে দুটা বার্গার খেলাম। টিয়া দুপুরে ভাত ছাড়া কিছু খায় না। ভাতের সঙ্গে তিন চারপদ তরকারি লাগে।

সরি! বিরাট একটা ঝামেলায় আটকা পড়েছিলাম। এক কাজ করি তেহারি নিয়ে আসি। তেহারি খাবি?

কিছু একটা আন। আমার মেয়ের জিনিস আনা হয়েছে?

শুধু দুধ এনেছি আর কালোজাম এনেছি।

বাকিগুলো আন নাই কেন?

নিয়ে আসব। নো প্রবলেম। এক গাদা রঙ কিনেছি। রাতে তোর মেয়ের ছবি এঁকে দিব।

মীনা বলল, শুধু ছবি দিয়ে পার পাবার চেষ্টা করবে না ভাইয়া। সোনার কিছু দিতে হবে। না হলে শ্বশুর বাড়িতে আমার মুখ থাকবে না। সবাই জিজ্ঞেস করবে মেয়ের একটা মাত্র মামা, সেই মামা কী দিলো?

জহির বলল, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

মীনা বলল, তুমি টিয়ার হাতে কিছু টাকা দিয়ে রেখো। তোমার বাসায় বেড়াতে এসে সে নিজের টাকা খরচ করবে কেন? তুমি সম্বন্ধি না?

ও নিজের টাকা কখন খরচ করল?

বার্গার কিনে আনল না। টুনটুনিকে রোজ দুটা করে ডিমের কুসুম খাওয়াই। তাকে দিয়ে ডিম কিনালাম। তোমার ঘরে তো ডিমও নেই।

ঠিক আছে কিছু টাকা ধরিয়ে দেব।

তোমার দেখি মুখ শুকিয়ে গেল। তুমি এত কৃপণ হয়ে গেলে কীভাবে? শুধু তেহারী আনবে না ভাইয়া। তেহারীর সঙ্গে আলাদা মাংস আনবে।

যদি পাই আনব। টিয়া বাবু কোথায়?

ঘুমাচ্ছে। ভাইয়া শোন, তুমি টিয়াবাবু ডাকছ কেন? টিয়া আমার দেয়া নাম। একটা পার্সোনাল ব্যাপার। তুমি তাকে তার নামে ডাকবে। আর কখনও টিয়াবাবু বলবে না।

যা আর ডাকব না।

টুনটুনিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। কোলে নিলে সে শান্ত হয়ে থাকবে। মামার সঙ্গে পরিচয় হোক।

মেয়ে কোলে নিয়ে ঘুরতে পারব না।

কেন পারবে না? মামা ভাগ্নিকে কোলে নিবে না।

কোলে নেবে, কিন্তু কোলে নিয়ে সারা ঢাকা শহর ঘুরবে না।

ভাইয়া তুমি বদলে গেছ এটা জান। তোমার মুখ দেখে পরিষ্কার বুঝা যায় তুমি আমাদের উপর খুবই বিরক্ত। আমরা কি হঠাৎ বেড়াতে এসে তোমার কোনো প্রবলেম করেছি।

তুই কথা বেশি বলিস এইটাই প্রবলেম। এ ছাড়া কোনো প্রবলেম নেই।

জহির তেহারির সন্ধানে বের হলো। টিয়াবাবুর আসল নাম এখনো মনে আসছে না। সালাম? না সালাম না? সালাহউদ্দিন? না সালাউদ্দিন না। সাগর? উহু! সাগরও না। দস্তস দিয়ে আর কী নাম আছে? নিউ মার্কেট থেকে নবজাতকের নতুন নাম জাতীয় কোনো বই কিনে আনলে কেমন হয়?

নিউ মার্কেটের কথায় মনে পড়ল ফজলুকে টাকা দিতে হবে। নিউ মার্কেটের কাঁচাবাজারে একটা ঘর নিয়ে ফজলু থাকে। তার হাত একেবারেই খালি। এর মধ্যে ধরেছে ইনফ্লুয়েনজায়। ডাক্তার দেখিয়েছে কি-না, কে জানে। তার যে স্বভাব! নিশ্চয়ই না খেয়ে বিছানায় পড়ে আছে।

তেহারি কিনতে সামান্য দেরি হলে ময়না এবং টিয়া মারা যাবে না। দুজনের পেটেই বার্গার আছে। বার্গার ভাতের মতো চট করে হজম হয়ে যায় না। অনেকক্ষণ পেটে থাকে।

ফজলুকে তার ঘরে পাওয়া গেল না। পাশের ঘরের এক ছেলে বলল, উনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন?

জহির বলল, কোন হাসপাতাল? কত নাম্বার বেড।

কত নম্বর বেড জানি না। ঢাকা মেডিকেল।

অবস্থা খারাপ না-কি?

জি খারাপ।

জহির রিকশা নিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে রওনা হলো।

ফজলুকে সহজেই খুঁজে বের করা হলো। হাসপাতালে তার সীট এখনো হয়নি। বারান্দায় আপাতত শুইয়ে রাখা হয়েছে। পাশে স্ট্যান্ডে স্যালাইনের ব্যাগ ঝুলছে। স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। চেহারা হয়েছে কাকলাশের মত। চোখ ঢুকে গেছে। মুখ ভর্তি কালো কালো ছোপ।

জহির বলল, অবস্থা কী?

ফজলু বলল, এখন একটু ভালো। কাল তো মনে হচ্ছিল এই বুঝি গেলাম। আজরাইল হাত ধরে টানাটানিও করেছে।

তোর টাকা নিয়ে এসেছি।

কত এনেছিস?

যা নিয়েছিলাম সবটাই এনেছি। দরকার লাগলে আরও দেব। টাকা সঙ্গে আছে।

তোর কাছে রেখে দে। এখানে টাকা রাখব না। চুরি হয়ে যাবে। আব্দুল কাদের বলে এখানে একজন আছে। খুঁজে বের কর। তাকে পাঁচশ টাকা ঘুষ দে। ঘুষ দিলে সীটের ব্যবস্থা হবে।

আব্দুল কাদেরটা কে?

খুঁজে বের কর কে। ক্লিনিকেল সেকশানে। সবাই চেনে। এত কথা বলতে পারব না।

খাওয়া-দাওয়া কী করছিস?

খাওয়া-দাওয়া কিছুই করছি না। স্যলাইন দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে স্যালাইনটা আমার পোলাও-কোরমা। তোর কাছে কাগজ-কলম আছে?

কাগজ-কলম দিয়ে কী হবে?

মা'র ঠিকানা লিখে দেব। মা'কে দুই হাজার টাকা পাঠিয়ে দিবি। আমার খবর কিছুই জানাবি না।

আব্দুল কাদেরকে খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগল। পাঁচশ টাকার বদলে তাকে দেয়া হলো পনেরশ টাকা। সে অন্য এক রোগীকে সীট থেকে নামিয়ে ফজলুকে সীটে তুলে দিল। গম্ভীর গলায় বলল, টাইট হইয়া শুইয়া থাকেন। কেউ কিছু বললে আমার নাম বলবেন। ক্লিয়ার?

সব ঝামেলা মিটিয়ে জহির বাসার দিকে রওনা হলো রাত এগারোটায়। তার হাতে দুই প্যাকেট কাচ্চি বিরিয়ানী। সে নিজে কিছু খাবে না। তার শরীর গুলাছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। হাসপাতালে গেলেই তার এই সমস্যা হয়।

মৃন্ময়ীর দাদা আলিমুর রহমান শাদা হাফ পেন্ট পরে খালি গায়ে নিমগাছের নিচে উবু হয়ে বসে আছেন। গায়ে নিমের বাতাস লাগানোর ব্যবস্থা। কবিরাজ এই বিধান দিয়েছে। কবিরাজের নাম বিজয়কালী ঠাকুর বেদান্ত শাস্ত্রী। আলিমুর রহমানের হযমের সমস্যা কিছুই খেতে পারেন না।

সকালে এক ঘণ্টা নিমের বাতাস। দুপুরে চায়ের চামুচে এক চামচ নিমপাতা পিসা রস। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে নিমগাছের ছাল ভেজানো পানি। এই চিকিৎসার নাম মহানিম চিকিৎসা। চিকিৎসা সাতদিন চলবে। সাতদিন পর অন্য বিধান। আজ চিকিৎসার চতুর্থ দিন।

আলিমুর রহমান দূর থেকে মৃন্ময়ীকে দেখলেন। তার মেজাজ ভয়ংকর খারাপ ছিল। মেজাজ ঠিক হতে শুরু করল। তিনি আশেপাশে তাকালেন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা এসে বসবে কোথায়? মাটিতে নিশ্চয়ই বসবে না? তার মেজাজ আবারো খানিকটা খারাপ হলো। সাভারের তার এই খামার বাড়িতে খুব কম করে হলেও পনেরোজন লোক। আশে পাশে কেউ নেই এটা কেমন কথা?

ম্যানেজারকে এখন অবশ্যি দেখা যাচ্ছে। শীতল পাটি হাতে দৌড়ে আসছে। আলিমুর রহমানের মেজাজ ঠিক হলো। পুরোপুরি না, তবে কাজ চলাবার মতো।

মৃন্ময়ী বলল, দাদাজান দূর থেকে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল ধবধবে শাদা একটা ব্যাঙ লাফ দেওয়ার জন্যে বসে আছে। ব্যাঙটার সামনে পুকুর। সে লাফ দিয়ে পুকুরে পরবে।

আলিমুর রহমান বললেন, পরীক্ষা শেষ নাকি?

ফার্স্ট পেপার শেষ। তিন দিনের গ্যাপ আছে। তোমাকে দেখতে এসেছি। দাদাজান আমি রাতে কিন্তু থাকব।

থাকতে চাইলে থাকবি। এত বলাবলির কি আছে।

ঢাকায় লোক পাঠিয়ে আমার বইখাতা আনিয়ে দাও। বই ছাড়া চলে এসেছি। রাতে থাকব এ রকম চিন্তা করে তো আসি নি।

হঠাৎ চিন্তাটা করলি কেন?

তোমাকে একা একা বসে থাকতে দেখে মায়া লাগল। তখনই ঠিক করলাম রাতে থাকব। তোমার সঙ্গে গল্প করব।

গল্প করলে পড়বি কখন?

এক রাত না পড়লেও হবে।

বইখাতা আনতে লোক পাঠাতে হবে না?

না।

মৃন্ময়ী পাটিতে বসেছে। সে দাদাজানের দিকে তাকিয়ে বলল, পাটিতে এসে বসো। আমি তোমার পিঠ ডলে দিব।

আলিমুর রহমান পাঠিতে উঠে এলেন। এখন তার মেজাজ সর্বোচ্চ ভালো স্তরে।

নিম চিকিৎসা চলছে দাদাজান?

হুঁ।

আজকে ফোর্থ ডে না?

হ্যাঁ।

আলিমুর রহমান খুবই অবাক হলেন মেয়েটা মনে রেখেছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো কোনো কিছুই মনে রাখে না। তিনি মৃন্ময়ীকে একবার শুধু টেলিফোনে বলেছিলেন শুক্রবার থেকে নিম চিকিৎসা।

আলিমুর রহমান বললেন, গাধাটা আছে কেমন?

বাবার কথা বলছ?

গাধা তো ঐ একটাই।

বাবা ভালো আছে।

গাধার স্ত্রী আছে কেমন?

মাও ভালো।

এখনও ঘর অন্ধকার করে বসে থাকে?

হুঁ। দাদাজান তোমার ম্যানেজারকে তেল আনতে বল। তোমার পিঠে তেল দিয়ে দেব।

বাদ দে।

বাদ দেব কেন? ম্যানেজারকে ডাক। আমি কফি খাব। কফির নতুন কৌটা কিনেছ, নাকি ছাতা-পড়া ঐটাই আছে।

আলিমুর রহমান তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, তুই যা-ই চাবি তা-ই পাবি।

প্রয়োজনে কফির বাগান কিনব। তবে তোর গাধা-বাবাকে একটা শিক্ষা আমি দিব। কঠিন শিক্ষা। বাবাজী টাইপ শিক্ষা।

সেটা কেমন?

শিক্ষা শেষ হলে শুধু বাবাজী বাবাজী করবে। এর নাম বাবাজী শিক্ষা।

বাবা কি নতুন কিছু করেছে?

আমার কাছে নোট পাঠিয়েছে। ইংরেজি নোট তার নাকি কিছু টাকার প্রয়োজন।

তুমি কি করেছ, টাকা পাঠিয়েছ?

আমি নোটের জবাবে নোট দিয়েছি। চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছে। কি লিখেছি তোকে পড়ে শুনাই। ম্যানেজার গাধাটা আবার গেল কোথায়?

দাদাজান তুমি কি সবাইকে গাধা ডাক নাকি?

সবাইকে ডাকি না। তোর বাবাকে ডাকি আর ম্যানেজারটাকে ডাকি। দু'জনই একই লেভেলের গাধা। এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। দেশে রাখার জিনিস না। বিদেশে পাঠিয়ে দেবার জিনিস।

মৃন্ময়ী কফি খাচ্ছে। তার মুখ হাসি হাসি। আলিমুর রহমান নাতনীকে চিঠি পড়ে শুনাচ্ছেন।

শাহেদুর রহমান
১১৫ বারিধারা

বিষয় : ১৬ -৭- ২০০৫ এ প্রেরিত ইংরেজিনোটের জবাবে

গাধা পুত্র
তোমার ইংরেজি পত্র পাইয়াছি। পত্রের জবাব এই যে তোমাকে আর কিছুই দেওয়া হইবে না। দশ টাকার ছেড়া স্কচ টেপ লাগানো নোটও না। তুমি যে চারতলা বাড়িতে বাস করিতেছ সেই বাড়ি আমার নামে। এক মাসের ভিতর তুমি বাড়ি খালি করিয়া দিবে। তোমার মতো অপদার্থ ষাড়ের গোবরকে টাকা নামক অক্সিজেন সাপ্লাই করিবার কোনো প্রয়োজন আমি বোধ

করিতেছি না। আমি বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড কোম্পানী না। তুমি গর্ধব কুলেরও কলঙ্ক।

ইতি
তোমার পিতা
আলিমুর রহমান

চিঠি শেষ করে আলিমুর রহমান বললেন, মুসাবিদা কেমন দেখলি?

মৃন্ময়ী বলল, সত্যিই এই চিঠি পাঠিয়েছ?

আলিমুর রহমান বললেন, অবশ্যই। প্রথম চিঠির পর দ্বিতীয় চিঠি গেছে, তৃতীয় চিঠি গেছে।

দেখি দ্বিতীয় তৃতীয়তে কী লিখেছ?

ঐ চিঠিগুলোতে শুধুই গালাগালি। মুখে গালি দিতে পারছি না বলে চিঠিতে গালি। গালাগালি পড়তে পারব না। তুই পড়ে নে।

মৃন্ময়ীর মুখভর্তি হাসি। সে আগ্রহ নিয়ে চিঠি পড়ছে। আলিমুর রহমান নাতনীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। চিঠি পড়তে পড়তে একেকবার এই মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠছে। কী সুন্দর দৃশ্য! আলিমুর রহমানের মনে হলো আরো কয়েকটা চিঠি থাকলে ভালো হতো।

(দ্বিতীয় চিঠি)

গাধাপুত্র
অক্সিজেনের অভাব বোধ করিতেছ? শুধু অক্সিজেন বন্ধ করিয়া তোমাকে শায়েস্তা করা যাইবে না। তোমার নাক দিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড ঢুকাইতে হইবে। তবে যদি তুমি শায়েস্তা হও।

ইতি
তোমার পিতা
শায়েস্তা খান
(আলিমুর রহমান)

(তৃতীয় চিঠি)

শাহেদুর রহমান
বারিধারা

বিষয়: তোমার অবস্থান বিষয়ক।

তুই গাধা। তুই গাধা। তুই গাধা। তুই গাধা।
তুই গাধা। তুই গাধা। তুই গাধা। তুই গাধা।
তুই গাধা। তুই গাধা। তুই গাধা। তুই গাধা।

ইতি
তোমার পিতা
শায়েস্তা খান
(তোমাকে শায়েস্তা করা হইবে)

মৃন্ময়ী বলল, তোমার চিঠি পড়ে খুবই মজা পেয়েছি। তবে এই চিঠিতে কাজ হবে না। বাবাও চিঠি পড়ে মজা পাবে। শায়েস্তা হবে না।

আলিমুর রহমান বলবেন, আমার মাথায় আরো প্ল্যান আছে। চিন্তা করছি। তোমার বাবা না-কি এখন ছবি আঁকা ধরেছে?

হুঁ। তার একজন টিচার আছে। জহির নাম। সপ্তাহে তিন দিন এসে ছবি আঁকা শিখাবে।

তোর বাবা তাহলে পিকাসো হয়ে যাচ্ছে? মহান বাংলাদেশি পিকাসো। পিকাসোর মাথায় তো চুল ছিল না। নাপিত ডেকে তোর বাবার মাথাটা কামিয়ে দে না।

দাদাজান বাবা প্রসঙ্গ বাদ থাকুক। আমি বাবাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসি নি। তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।

দুপুরে কী খাবি?

তুমি যা খাওয়াবে তা-ই খাব।

পুকুর থেকে নিজের হাতে মাছ ধরে দেই?

দাও।

আলিমুর রহমানের পুকুর পুরানো জমিদার বাড়ির পুকুরের মতোই বিশাল।

তিন ঘাটের পুকুর। বরশি ফেলার জন্যে আলাদা মাচা করা আছে। মাথার উপর খড়ের চালা, যেন মাছ মারার সময় মাথায় রোদ না লাগে।

বিপুল আয়োজনে আলিমুর রহমান মাছ মারতে বসেছেন। পাশেই পাটি পেতে শুয়ে আছে মৃন্ময়ী। মৃন্ময়ীর হাতে একটা বই। বইটার নাম The Chariots of Home. সায়েন্স ফিকশান।

মৃন্ময়ীর প্রচুর গল্পের বই, গানের সিডি, ছবির ভিসিডি, দাদাজানের খামার বাড়িতে রাখা।

মৃন্ময়ী বলল, দাদাজান আমি যদি গান শুনতে শুনতে বই পড়ি তোমার মাছ মারায় অসুবিধা হবে?

না। গানের যন্ত্র এনেছিস?

নিয়ে আসব।

ম্যানেজারকে বলে দেই, সে নিয়ে আসুক।

উনি কোন গান আনতে হবে বুঝবেন না। দাদাজান তুমি গান পছন্দ কর না?

না।

বই পড়তে পছন্দ কর?

না।

ছবি দেখতেও পছন্দ কর না?

না।

পছন্দ না করলেও আজ রাতে তোমাকে নিয়ে একটা ছবি দেখব। আমার একা একা ছবি দেখতে ভালো লাগে না।

আলিমুর রহমান বললেন, তোর কি কোনো ছেলের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা হয়েছে?

না।

যদি কাউকে মনে ধরে আমারএখানে নিয়ে আসবি। আমি পরীক্ষা করে দেখব বুদ্ধিশুদ্ধি আছে কি-না।

বুদ্ধি দিয়ে কী হবে? হাসবেন্ড হিসেবে বোকাই ভালো।

কখনও কোনো বোকার ধারেকাছে যাবি না।

আচ্ছা যাব না। দাদাজান! শুনো আমি কিছুক্ষণ ঘুমাব। তোমার বরশিতে যদি বড় কোনো মাছ ধরা পড়ে আমাকে ডেকে তুলবে। আমি সূতা ছাড়ব।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোর কি ক্ষিধে লেগেছে? কিছু খাবি।

ক্ষিধে লেগেছে কিন্তু আমি কিছু খাব না। আচ্ছা দাদাজান তোমার তো প্রচুর

টাকা। কি করবে এত টাকা দিয়ে।

তুই চাইলে তোকে দিয়ে দিব। তুই চাস?

না। কখনও না।

তুই একটা বুদ্ধি বের কর, বিলি-ব্যবস্থা কি করা যায়।

হাসপাতাল বানাবে?

হাসপাতাল বানাতে যাব কোন দুঃখে?

অনাথ আশ্রম?

ভুলে যা। দুনিয়ার অনাথ এক জায়গায় এনে তাদের ক্যাঁচক্যাচানি শোনার আমার কোনো শখ নেই।

ইউনিভার্সিটি বানাবে। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে ইউনিভার্সিটি।

আমি কি রবীন্দ্রনাথ যে শান্তি নিকেতন বানাব?

তাহলে কি করা যায়। ভালো সমস্যা হলো তো।

চিন্তা করে বের কর। আমিও চিন্তা করে কিছু পাচ্ছি না।

দাদাজান তোমার টাকা এবং সম্পত্তি সব একত্র করলে কত টাকা হবে?

জানি না কত হবে।

আনুমানিক কত হবে বল, ১৭ কোটি কি হবে?

হবে।

তাহলে এক কাজ কর। বাংলাদেশের সব মানুষের মধ্যে সমানভাবে এই টাকাটা ভাগ করে দাও। সবাই এক টাকা করে পাবে।

আলিমুর রহমান হো হো করে হেসে উঠলেন।

এত আনন্দ নিয়ে তিনি অনেকদিন হাসেন নি।

মৃন্ময়ী বলল, তোমার হাসির শব্দে সব মাছ তো পালিয়ে যাবে।

আলিমুর রহমান আরো শব্দ করে হেসে উঠলেন।

ট্রেতে করে চা নিয়ে খামার বাড়ির ম্যানেজার এসেছে। ম্যানেজারের নাম কালাম। কালাম করিৎকর্মা লোক। কিন্তু বড় সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালে তার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। বুক ধড়ফড় করতে থাকে। বড় সাহেবের সব কথাও তখন ঠিকমতো কানে ঢুকে না। তার প্রায়ই মনে হয় এই চাকরি ছেড়ে সে অন্য কোনো চাকরিতে ঢুকবে। চব্বিশ ঘণ্টা আতঙ্কের মধ্যে বাস করার কোনো অর্থ হয় না।

কালাম বলল, স্যার আপনার কাছে একজন আর্টিস্ট এসেছে।

আলিমুর রহমান বললেন, আমার কাছে আর্টিস্ট আসবে কেন?

ঢাকা থেকে ছোট সাহেব পাঠিয়েছেন। আর্টিস্ট আপনার ছবি আঁকবে।

আলিমুর রহমান বললেন, তাকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দাও।

কালাম বলল, জি আচ্ছা স্যার।

হাসিমুখে বিদায় করবে না। গলা ধাক্কা দিয়ে বিদায় করবে। এমনভাবে ধাক্কা দিবে যেন পা চেগায়ে উল্টে পড়ে।

জি আচ্ছা স্যার।

মৃন্ময়ী বলল, দাদাজান তুমি বাবার উপর রাগ করে অন্য একজনকে গলা ধাক্কা দিতে পার না। আর্টিস্টের তো কোনো দোষ নেই। বাবা তাকে পাঠিয়েছে তিনি এসেছেন। তুমি যদি ছবি আঁকাতে না চাও বলবে ছবি আঁকাব না। তাকে ভদ্রভাবে চলে যেতে বলবে।

আলিমুর রহমান কালামের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাকে ভদ্রভাবে চলে যেতে বল।

কালাম ঘাড় কাত করে সঙ্গে সঙ্গে বলল, জি আচ্ছা স্যার।

মৃন্ময়ী বলল, ভর দুপুরে একজন এত দূর এসেছে, তাকে না খাইয়ে বিদায় করে দেওয়াও ঠিক না।

আলিমুর রহমান বললেন, কালাম তাকে ভাত খাইয়ে তারপর বিদায় কর।

কালাম আবারও ঘাড় নেড়ে বলল, কি আচ্ছা স্যার।

কালামের বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। বেশিক্ষণ এখানে থাকলে ব্যথা বাড়বে। সে দ্রুত হাঁটা ধরল।

আলিমুর রহমানের ছিপে মাছ বেঁধেছে। সূতার টান থেকে বুঝা যাচ্ছে তিন থেকে চার কেজি হবে। এরচেয়ে বড়ও হতে পারে। ঠিকমতো সূতা ছাড়তে না পারলে মাছ রাখা যাবে না।

আলিমুর রহমান চেঁচিয়ে বললেন, মৃন্ময়ী ছিপ ধর।

আলিমুর রহমান হাপাচ্ছেন। আনন্দে ও উত্তেজনায় তার চোখ-মুখ ঝলমল করছে। মৃন্ময়ী বলল, তিমিমাছ নাকি দাদাজান! মাছের এত শক্তি!

আলিমুর রহমান বললেন, খুব সাবধানে সূতা ছাড়। মাছ কিন্তু হ্যাচকা টান দিয়ে তোকে পানিতে ফেলতে পারে।

মৃন্ময়ী বলল, দাদাজান তুমি ছিপটা ছেড়ে দিলে কি মনে করে। আমি একা পারব না কি, তুমিও ধর।

আলিমুর রহমান বললেন, গাধা কালামটা আবার গেল কোথায়? থাপড়ায়ে এর দাঁত যদি আমি না ফেলি।

মাছের প্রবল টানে মৃন্ময়ী ঝুপ করে পানিতে পড়ে গেল।

আলিমুর রহমান বললেন, ছিপ ছাড়বি না। ছিপ ধরে থাক।

মৃন্ময়ী এক হাতে ছিপ উঁচু করে রেখে সাতরাচ্ছে। কী সুন্দর দৃশ্য! আলিমুর রহমানের কাছে মনে হলো তিনি এত মধুর দৃশ্য তার জীবনে আর দেখেন নি।

মাছ ডাঙ্গায় তোলার পর ওজন দেয়া হলো। কাতল মাছ। ওজন পাঁচ কেজি তিনশ গ্রাম। মৃন্ময়ী বলল, দাদাজান মাথাটা আমি খাব।

আলিমুর রহমান বললেন, ভাগাভাগি করে খাই। দুজনে মিলে ধরলাম না?

জহির অবাক হয়ে বলল, আপনি এখানে?

মৃন্ময়ী বলল, এত অবাক হচ্ছেন কেন? এটা আমার দাদার খামারবাড়ি। আমি তো এখানে থাকতেই পারি। বরং আমার উচিত আপনাকে দেখে অবাক হওয়া। আমি অবশ্যি সে রকম অবাক হচ্ছি না।

জহির বলল, আপনার বাবা আমাকে কমিশন করেছেন আমি যেন আপনার দাদার একটা পোর্ট্রেট করে দেই।

দাদা নো বলে দিয়েছেন। উনার নো মানে কেপিটেল এন কেপিটেল ও।

আমাকে কালাম সাহেব বলেছেন। আমি চলে যেতে চাচ্ছিলাম, উনি খেয়ে যেতে বললেন।

অবশ্যই খেয়ে যাবেন। কাতল মাছের একটা প্রিপারেশন আপনাকে দেয়া হবে। মাছটা আমি ধরেছি।

জহির খুবই অবাক হচ্ছে মেয়েটার সহজ কথা বলার ভঙ্গিতে। প্রথম দিনে তার কথায় ও চেহারায় কাঠিন্য ছিল। আজ একবারেই নেই।

মৃন্ময়ী বলল, আপনি কি ভালো পোর্ট্রেট করেন?

জহির বলল, যখন মন দিয়ে করি তখন ভালো করি। বেশির ভাগ সময় মন লাগে না।

কখন মন লাগে না?

যার ছবি আঁকছি তাকে পছন্দ না হলে ছবিতে মন লাগে না।

একটা পোর্ট্রেট করতে আপনি কত টাকা নেন?

ধরাবাধা কিছু নেই। চেষ্টা থাকে যত বেশি নেয়া যায়। ক্লায়েন্ট বুঝে দাম।

আমার কাছ থেকে আপনি কত নেবেন? আমি যদি আপনাকে কমিশন করি।

আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই নেব না।

কেন নেবেন না?

আপনি আমার বড় একটা সমস্যা সমাধান করিয়েছিলেন এই জন্যে নেব না। তাছাড়া আপনার ছবি আঁকার জন্যেও আপনার বাবা আমাকে কমিশন করেছেন।

মৃন্ময়ী বলল, আমিও আমার দাদাজানের মতো। কাউকে দিয়ে ছবি আঁকাই না। তবে আমি আমার এক বান্ধবীর ছবি আঁকার জন্য আপনাকে কমিশন করব। আমার খুব প্রিয় বান্ধবী। আপনি যত্ন করে তার ছবি এঁকে দেবেন।

অবশ্যই দেব।

সে যতনা সুন্দর, আপনি তাকে আরও সুন্দর করে আঁকবেন।

চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না।

শুধু তার নাকে একটা হীরের নাকফুল দিয়ে দেবেন। আমি নাকফুলটার ডিজাইন আপনাকে দিয়ে দেব।

জি আচ্ছা।

আমার দাদাজানের খামারবাড়ি কি আপনি ঘুরে দেখেছেন?

জি না।

ঘুরে দেখুন। খামারবাড়ির পুরো পরিকল্পনা আমার। আপনি শিল্পীমানুষ। আপনার মাথায় যদি কোনো আইডিয়া আসে আমাকে বলবেন।

জহির মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। আজ মেয়েটিকে প্রথম দিনের চেয়ে সুন্দর লাগছে। ব্যাপারটা হাস্যকর। সৌন্দর্য্য সময় নির্ভর না। ভোরবেলার ফুল বিকেলেও সুন্দর। মেয়েটি আজ শাড়ি পড়েছে এটা কি একটা কারণ? প্রথম যখন দেখা সেদিন তার পোষাক কী ছিল? শাড়ি ছিল না? জহির মনে করতে পারল না। যেদিন টাকা ফেরত দিতে গেল সেদিন মৃন্ময়ীর সঙ্গে দেখা হয় নি। ম্যানেজার ফরিদের হাতে টাকা দিয়ে এসেছে। ফরিদ কি টাকা ফেরত দিয়েছে? ব্যাপারটা মৃন্ময়ীকে জিজ্ঞেস করা কি উচিত? ত্রিশ হাজার টাকা এদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। টাকাপয়সা এদের কাছে তেজপাতা। কিংবা তেজপাতার চেয়েও তুচ্ছ কিছু। কাঁঠালপাতা, আমপাতা। আমপাতার কথায় মনে পড়ল মীনা তাকে আমের মুকুল নিয়ে যেতে বলেছে। আমের মুকুল দিয়ে কি এক টক রান্না না-কি টিয়া পছন্দ করে।

জহিরের মেজাজ খারাপ হয়েছে। ঢাকা শহরে সে আমের মুকুল পাবে কোথায়? সে তো আমবাগানে বাস করছে না। মীনাকে এই সব বলা অর্থহীন।

ভাইয়া শোন, মুকুল যে আনবে মিষ্টি আমের মুকুল আনবে না, টক আমের মুকুল আনবে।

জহির বলল, মিষ্টি টক বুঝব কীভাবে? মুকুল চিবিয়ে দেখব?

ভাইয়া বোকার মতো কথা বলো না তো। তুমি যে গাছের মুকুল আনবে সেই গাছের আম টক কি না জিজ্ঞেস করবে।

ও আচ্ছা।

টুনটুনিকে যে সোনার কিছু দিতে বলেছিলাম তার কী করবে? শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আমি বেইজ্জত হব তাই চাও?

তোরা যেদিন চলে যাবি সেদিন পাবি।

তোমার বাজেট কত বল? আমি গয়নার দোকানে গিয়ে দেখব এই বাজেটে কি পাওয়া যায়।

বাজেট এখনও ঠিক করি নি। দেখি কি করা যায়।

ভাইয়া তোমার এখানে আসার পর থেকে আমরা ঘরের রান্না খাচ্ছি। ঢাকায় এত বড় বড় রেস্টুরেন্ট হয়েছে— আমাদের বাইরে খাওয়াও। একদিন পীজা হাটে নিয়ে যাও।

হবে ব্যবস্থা হবে।

জহির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মীনার সঙ্গে একদিন বসতে হবে। তার অনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে। যেদিন এই বৈঠক হবে সেদিন সে সরাসরি বলবে, মীনা তোর স্বামীর নামটা যেন কী? আমি নাম ভুলে গেছি। নাম বল। নাম দিয়ে শুরু হোক। এই ঘটনা দ্রুত ঘটিয়ে ফেলতে হবে। শুভস্য শীঘ্রম যেমন সত্যি অশুভস্যও শীঘ্রম। অশুভ ঘটনাও দ্রুত ঘটিয়ে ফেলতে হয়। দেরি করা যায় না।

জহির ঘুরে ঘুরে খামারবাড়ি দেখছে। এক জায়গায় নকল পাহাড়ের মতো করা হয়েছে। নকল ঝরনা বসেছে। ঝির ঝির করে পানি পড়ছে। ঝরনার পেছন থেকে পানির পাম্পের শব্দ কানে আসছে। হাস্যকর ব্যাপার।

আরেক জায়গায় গোল করে লাগানো সুপাড়ি গাছের সারি পাওয়া গেল। মাঝখানে বসার ব্যবস্থা। মার্বেল পাথরে বানানো বেঞ্চ। কয়েক লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই মার্বেল পাথরের পিছনে খরচ হয়েছে। এই জিনিসটা হয়েছে হাস্যকর। বসার জায়গায় মাথার উপরে ছায়া থাকতে হবে। সুপারি গাছে ছায়া দেয় না।

আরেকটু আগাতেই আম বাগান পাওয়া গেল। প্রচুর আমগাছ। প্রতিটি গাছের গোড়া ক্যান্টনমেন্টের গাছের মতো শাদা রঙ করানো। সবাই যেন শাদা প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। ফরোয়ার্ড মার্চ বলার সঙ্গে সঙ্গেই এরা সামনের দিকে মার্চ শুরু করবে। বেশ কিছু আমগাছে মুকুল ফুটেছে। আশেপাশে কেউ নেই। দূর থেকে কেউ নিশ্চয়ই দুরবিন দিয়ে তাকে দেখছে না। পকেট ভর্তি করে আমের মুকুল নিয়ে যাওয়া যায়। টিয়াবাবু আমের মুকুলের টক খাবে। খা টক খা।

রাতে আলিমুর রহমানের শরীর খারাপ হলো। শ্বাস কষ্ট। বুকে ব্যথা। তিনি মুখ বড় করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। মৃন্ময়ী চিন্তিত গলায় বলল, চল ঢাকা চলে যাই।

আলিমুর রহমান বললেন, দুপুরে বেশি খেয়ে ফেলেছি বলে এই অবস্থা। ঠিক হয়ে যাবে।

এ রকম কি প্রায়ই হয়?

যেদিন বেশি খেয়ে ফেলি সেদিন হয়।

ঠিক হতে কতক্ষণ লাগে?

কোনো কোনো দিন চট করে ঠিক হয়। কোনো কোনো দিন চার-পাঁচ দিন লাগে।

ঘরে কি অক্সিজেনের সিলিন্ডার আছে?

না। দরজা জানালা সব খুলে দে। এতেই হবে।

দাদাজান আমার কথা শোন। চল ঢাকায় চলে যাই। তোমাকে কোনো একটা ক্লিনিকে ভর্তি করি।

আলিমুর রহমান হাপাতে হাপাতে বললেন, ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে।

তার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হলো রাত একটায়। তিনি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, বলেছিলাম না ঠিক হয়ে যাবে। আর কালাম গাধাটাকে বল এক কাপ লেবু চা আর কাগজ-কলম আনতে।

কাগজ কলম দিয়ে কী হবে?

আমি উইল করব।

চা খাও। খেয়ে ঘুমাও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

উইল করে তারপর ঘুমাব। অবস্থা তো দেখছিস। যে কোনো একদিন মরে যাব। আর তখন আমার গাধাপুত্র সব দখলকরে বসে থাকবে। দু হাতে টাকা উড়াবে। ছবি কিনবে। দুই কোটি তিন কোটি টাকা দিয়ে জমি কিনবে জমির দখল নিতে পারবে না।

মৃন্ময়ী বলল, উইল করা হবে। এখন না, কাল ভোরে।

আমি এখনই করব।

মৃন্ময়ী বলল, আচ্ছা এখন আগে চা খাও। চা খেয়ে চোখ বন্ধ করে দশ

মিনিট রেস্ট নাও। তারপর যদি মনে কর উইল করা দরকার উইল করবে।

তোর কী চাই বল?

দাদাজান আমার কিছুই চাই না। তুমি অনেকবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছ তোর কী চাই? আমি প্রতিবারই বলেছি আমার কিছুই চাই না। এখনও আমার একই উত্তর।

আলিমুর রহমান হঠাৎ হাসতে শুরু করলেন। শিশুর হাসির মতো সরল আনন্দময় হাসি।

মৃন্ময়ী বলল, হাসছ কেন দাদাজান?

মজার একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে এই জন্যে হাসছি। তোর বাবাকে চূড়ান্ত শিক্ষা দেয়ার আইডিয়া।

বল শুনি।

তোর বাবা তো শিল্পবোদ্ধা হয়েছে। ছবি কিনে ঘর বোঝাই করবে। উইল করে তোর বাবাকে একটা ছবি দিয়ে যাব। সে আর কিছুই পাবে না।

কোন ছবি দেবে?

আজ যে আর্টিস্ট এসেছিল তাকে দিয়ে আঁকাব। আমার ছবি। আমি কঠিন চোখে তাকিয়ে আছি এ রকম ছবি। আইডিয়া কেমন?

আইডিয়া ভালো।

তোর বাবার শিক্ষা সফর হয়ে যাবে না?

হবার কথা।

আর্টিস্টকে টেলিফোন কর সে যেন এক্ষুনি রং-তুলি নিয়ে চলে আসে।

দাদাজান রাত বাজে দুটা। এ সময় কাউকে টেলিফোন করা যায় না। তাছাড়া আমি উনার টেলিফোন নাম্বারও জানি না। আমি ব্যবস্থা করে দেব যেন কালই উনি চলে আসেন।

আলিমুর রহমানের মাথায় আরও একটা আইডিয়া চলে এল। তিনি মৃন্ময়ীর দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তোর বাবা এখন যে বাড়িটায় থাকে সেই বাড়িটার ব্যাপারে কী করা যায়? তোর বাবা ধরেই নিয়েছে যে বাড়িটা তার। উইল যখন পড়া হবে তখন তার ব্রহ্মতালু জ্বলে যাবে। বাড়িটা কাকে দিলে তার ব্রহ্মতালু জ্বলবে।

এটা তো বুঝতে পারছি না।

আলিমুর রহমান বললেন, ঐ বাড়ির অতি তুচ্ছ কাউকে দিতে হবে, মালী দারোয়ান, কাজের বুয়াটুয়া কাউকে। যাকে তোর বাবা দু চোখে দেখতে পারে না।

মৃন্ময়ী বলল, বিন্তিকে দেয়া যায়।

বিন্তিটা কে?

আমাকে দেখাশোনা করে। নতুন এসেছে। বাবা কি কারণে যেন তাকে সহ্যই করতেপারে না।

ঠিক আছে বিন্তি। তোর বাবা এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে বিন্তি বিশাল বাড়ির মালিক। আর শিল্পবোদ্ধা শাহেদুর রহমান আমার একটা ওয়েল পেইনটিং হাতে নিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন। হা হা হা।

অতিরিক্ত হাসির কারণেই আলিমুর রহমানের বুকের ব্যথা আবার শুরু হলো। ভয়াবহ শ্বাস কষ্ট। সকাল আটটায় ব্যথা কমল। তিনি ঘুমুতে গেলেন। মৃন্ময়ী চলে এল ঢাকায়।

মীনা তার মেয়েকে গোসল দিচ্ছে। যথেষ্ট আয়োজনের গোসল। প্লাস্টিকের বেবি বাথটাব কেনা হয়েছে। বাথটাব ভর্তি ফেনা। টুনটুনি বাথটাবে বসে আছে। বাথটাবটা আট হয়ে তার গায়ে বসে গেছে।

জহির এসে পাশে বসতে বসতে বলল, ভোম্বা মেয়েকে এমন পিচকি গামলায় ঢুকিয়ে দিলি। বের করবি কীভাবে?

মীনা মুখ কালো করে বলল, এরচে বড় সাইজ বাথটাব নেই। আমি কী করব?

বাথরুমে নিয়ে গোসল করাবি।

এইবারে মীনার চোখে পানি এসে গেল। সে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, বাথটাব কিনে তোমার টাকা নষ্ট করেছি তো, এই টাকা আমি দিয়ে দিব।

জহির বিরক্ত হয়ে বলল, ঠিক আছে দিবি। এখন কান্না বন্ধ কর। দিনের মধ্যে দশবার চোখের পানি। অসহ্য!

মীনা বলল, আমার সব কিছুই তো অসহ্য। আমাকে অসহ্য। আমার মেয়েকেও অসহ্য। কত সহজে বলে ফেললে ভোম্বা মেয়ে। একদিন দেখলাম না কোলে নিয়ে আদর করতে। গালে একটা চুমু খেতে।

জহির উঠে পড়ল। তার খুবই বিরক্ত লাগছে। বিরক্তির প্রধান কারণ ড্রয়ারে বাজার খরচ হিসেবে রাখা পনেরশো টাকা নেই। খোজ নিয়ে জানা গেছে ঐ টাকা দিয়ে টিয়া এক কার্টুন সিগারেট আরো কি কি যেন কিনেছে। তার নাকি ডেইলি এক থেকে দেড় প্যাকেট সিগারেট লাগে।

ড্রয়ারের পনেরশো টাকা ছিল জহিরের শেষ সম্বল। আবার তাকে টাকার সন্ধানে বের হতে হবে। টাকা পাওয়া যাবে কি না কে জানে। একটা পত্রিকার অফিসে ইলাসট্রেটর হিসেবে যোগ দেবার কথা ছিল। পত্রিকার মালিক জানিয়েছেন আপাতত তারা নতুন কাউকে নিচ্ছেন না। পরে যোগাযোগ করতে।

অনেক ছবির দোকানে ছবি দেয়া আছে। কোথাও কিছু বিক্রি হয় নি। শ্রাবণী গ্যালারির মালিক কুদ্দুস সাহেব গলাটা খাটো করে বলেছেন, কামরুল

হাসানের তুলির টান রপ্ত করেন। তারপর উনার ঢংয়ে কয়েকটা ছবি একে নিয়ে আসেন। আমাদের লোক আছে অবিকল কামরুল হাসানের নকল করে সিগনেচার করে দেবে। পার পিস আপনাকে দেব পাঁচ হাজার। রাজি থাকলে ছবি আঁকেন। এস এম সুলতান কপি করতে পারলে পার পিস পনেরো করে দেব। জয়নুল নকল করতে পারলে পার পিস কুড়ি পাবেন। আপনার প্রতিভা আছে আপনি পারবেন। আমি খোলা মনে আপনাকে আমার অফার দিলাম। বাকিটা আপনার ইচ্ছা। না খেয়ে মরবেন, না নকল ছবি আঁকবেন সেটা আপনার বিবেচনা।

জহির সকাল থেকে কামরুল হাসানের তুলির টান দিচ্ছে। দুটি দাঁড়িয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। দুটাই বকের ছবি। একটাতে বক মাছ খাচ্ছে। তার ঠোঁটে মাছ। অন্যটাতে উড়ার প্রস্তুতি হিসেবে পাখা মেলেছে। জহিরের ধারণা কামরুল হাসান এই ছবি দুটি দেখলে নিজেও খুশি হতেন।

মীনা টুনটুনিকে টাওয়েল দিয়ে মুছাতে মুছাতে ভাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। কঠিন মুখে বলল, ভাইজান আমি ঠিক করেছি আজ চলে যাব।

জহিল বলল, আচ্ছা।

রাতে বাস যায়। রাতের বাসে যাব।

ঠিক আছে।

খালি হাতে আমি শ্বশুরবাড়িতে উঠতে পারব না। তুমি টুনটুনিকে সোনার কিছু দিবে বলেছিল। আমাকে টাকা দাও। আমি কিনে আনব।

এখন আমার হাতে কোনো টাকাপয়সা নাই। তোরা চলে যা, আমি টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠাব।

মীনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি তোমার বোন না পথের ফেলনা। ঠিক করে বল তো ভাইয়া। দশ দিন ধরে আছি। তুমি টুনটুনির বাবার সঙ্গে একটা কথা বল না। বেচারা একা বারান্দায় বসে থাকে। সামান্য কয়েক পেকেট সিগারেট কিনেছে, এই নিয়েও তুমি কথা শুনিয়েছ।

জহির বলল, কথা শুনাইনি তো। বলেছি অন্যের পয়সায় এত দামি সিগারেট খাওয়ার দরকার কী? আমি নিজে তো দেশীটা খাই।

দু দিনের জন্যে বেড়াতে এসে দামি সিগারেট যদি খায় তাতে অসুবিধা কী?

জহির হতাশ গলায় বলল, কোনো অসুবিধা নাই। বেশি করে খেতে বল। এখন সামনে থেকে যা।

মীনা কাঁদতে কাঁদতেই সামনে থেকে বের হয়ে গেল। এখন টুনটুনির

কান্নাও শোনা যাচ্ছে। মীনা রাগ ঝাড়তে গিয়ে মেয়ের গালেও চড়থাপ্পড় লাগিয়েছে। সে কখনও একা কেঁদে শান্তি পায় না।

জহির ছবি হাতে উঠে পড়ল। কান্নাকাটির মধ্যে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

কুদ্দুস সাহেব স্কেচ দুটি ভুড়ু কুঁচকে অনেকক্ষণ দেখলেন। কিছুই না বলে ড্রয়ার থেকে দশ হাজার টাকার একটা ব্যান্ডেল দিয়ে বললেন চা খাবেন?

জহির বলল, খাব।

কুদ্দুস বলল, জয়নুলের নকল করেন। উনি নিজেই নিজের ছবি প্রচুর নকল করেছেন। উনার ভালো ভালো ছবির চার পাঁচটা জেনুইন ভার্সান আছে। আপনার হাত ভালো। আপনি যদি করেন কোনো শালা ধরতে পারবে না। আপনাকে আমরা ঠকাব না।

জহির বলল, ঠিক আছে।

কবে দিবেন বলেন। আমার কাছে পার্টি আছে।

তাড়াতাড়িই দিব।

উনার দুর্ভিক্ষের কাক কিন্তু আঁকবেন। ডাস্টবিনের ময়লার পাশে শিশু, কাক এইসব। বিদেশীরা লুফে নিবে।

ঠিক আছে বক আর আঁকব না। এখন থেকে কাক।

আপনার ঐ বন্ধু কোথায়? ফজলু সাহেব। উনার হাতও ভালো।

জহির সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, শুধু হাত ভালো হলে হয় না, কপালও ভালো থাকতে হয়। তার কপাল মন্দ। সে হাসপাতালে। এখন মরে মরে অবস্থা।

বলেন কি! কোন হাসপাতাল? কত নম্বর কি বলুন তো একবার দেখতে যাব।

জহির উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, খামাখা হাসপাতালের নাম দিয়ে কী করবেন? আপনি যে দেখতে যাবেন না সেটা আপনিও জানেন আমিও জানি।

জহির বাসায় ফিরে বোনের হাতে টাকার বান্ডেলটা দিয়ে বলল, যা টুনটুনির জন্যে কিছু নিয়ে আয়।

মীনা গম্ভীর গলায় বলল, এখানে কত আছে?

দশ আছে।

এতে তো এক ভরিরও কিছ হবে না। সোনার ভরি এখন তেরো হাজার।

যা হয় তাই কিনবি এবং রাতের বাসে বিদায় হয়ে যাবি। আমি পথের ফকির। এই জিনিসটা যেদিন বুঝবি সেই দিন আবার বেড়াতে আসিস।

মীনা বলল, আমি আর কোনো দিনও আসব না। আমি যদি বাবা-মায়ের সন্তান হয়ে থাকি তাহলে তুমি আর কোনো দিন আমার মুখ দেখবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে। চিৎকার বন্ধ।

এই রইল তোমার টাকা। তোমার এই টাকা যদি আমি নেই তাহলে যেন আমার হাতে কুষ্ঠ হয়।

মীনা কাঁদছে। মীনার মেয়ে কাঁদছে। জহিরের বিরক্তির সীমা রইল না। বিকালের দিকে মীনা স্বাভাবিক। এক কাপ চা জহিরের সামনে রাখতে রাখতে বলল, ভাইয়া আমি ঠিক করেছি দশ আনার মধ্যে একটা চেইন কিনব। তোমার অবস্থাও তো দেখতে হবে। তোমার যে এমন খারাপ অবস্থা এটাও তো জানি না।

জহির বলল, তোরা কি রাতে যাচ্ছিস?

টিয়াকে পাঠিয়েছি টিকেট কাটতে। টিকিট পেলে অবশ্যই চলে যাব।

ঠিক আছে যা। এতদিন ঢাকায় পড়ে থাকারও কোনো মানে নেই।

ভাইয়া তুমি বলেছিলে টুনটুনির ছবি একে দিবে।

জহির বলল, তুই মেয়ে কোলে নিয়ে সামনে বোস। একে দিচ্ছি।

শাড়ি বদলে চুল বেঁধে আসি?

কিছুই করতে হবে না। আমি তো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছি না।

মীনা মেয়ে কোলে নিয়ে বসল। জহির বলল, কথা বলবি না। চুপচাপ বসে থাকবি।

মীনা বলল, কতক্ষণ লাগবে?

জহির বলল, দশ মিনিটও লাগতে পারে আবার দশ ঘণ্টাও লাগতে পারে।

দশ মিনিটের বেশি হলে কিন্তু আমি পারব না। আচ্ছা ভাইজান তুমি টিয়ার সঙ্গে কথা বল না কেন? আজ চলে যাবে তো। ওকে ডেকে ওর সঙ্গে একটু কথা-টথা বল।

আচ্ছা বলব। তোর বরের আসল নাম কী?

মীনা হতভম্ব হয়ে বলল, তুমি ওর নাম জান না?

ভুলে গেছি। মানুষ ভুলে যায় না।

মীনা থমথমে গলায় বলল, ওর নাম সবুজ। থাক তোমাকে আর ছবি আঁকতে হবে না।

মীনা মেয়ে কোলে নিয়ে উঠে গেল।

পাশের ঘর থেকে মীনার ফুপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই মেয়ে কাঁদতে শুরু করবে। শুরু হবে কোরাস। জহির ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। টুনটুনির চেহারা চলে এসেছে মীনার খানিকটা এসেছে। ছবিটা ভালো লাগছে দেখতে। মনে হচ্ছে এই ছবিতে আর কাজ না করলেও হবে। সামান্য শেড অবশ্যি দেয়া যায়। না দিলেও তেমন ক্ষতি হবে না। টুনটুনিকে সুন্দর লাগছে ছবিতে। বাচ্চাটার চেহারায় অন্য রকম মায়া আছে। ছবি আঁকার আগে ব্যাপারটা জহির লক্ষ করেনি। জহির আগ্রহের সঙ্গে ছবিতে নিজের নাম সই করল।*

সবুজ বাসের টিকেট কাটতে গিয়েছিল বিকাল চারটায়। মীনা পাঁচটার সময় কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, ভাইয়া ও টিকিট কাটতে গেছে এক ঘণ্টা হয়ে গেছে এখনো তো ফিরছে না।

জহির বলল, যেতে-আসতে সময় লাগবে না। তুই অল্পতেই এত অস্থির হয়ে যাস কী জন্যে?

মীনা বলল, ও দশ হাজার টাকার বান্ডেলটা নিয়ে গেছে।

তাতে সমস্যা কী? টিকিট কেটে বাকি টাকা ফেরত আনবে।

ড্রয়ারে পাঁচ প্যাকেট সিগারেট ছিল। সিগারেটও নিয়ে গেছে।

মীনা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করল।

জহির ধমক দিয়ে কান্না থামালো। টুনটুনি তার মা'কে ভালো কপি করা শিখেছে। মা কাঁদতে শুরু করলে সে কাঁদতে শুরু করে। মা থামলে সেও থামে।

মীনা বলল, ভাইয়া আমার খারাপ একটা সন্দেহ হচ্ছে। ও মনে হয় চলে গেছে।

জহির বলল, চলে গেছে মানে। কোথায় চলে গেছে।

---

* চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পেনসিল স্কেচ প্রতিযোগিতায় Unfinished শিরোনামে এই ছবিটি যৌথভাবে জাপানের ইতিমাশোর আঁকা Lovely bamboo tree ছবির সঙ্গে স্বর্ণপদক পায়।

মীনা বলল, আমি কিভাবে জানি কোথায় গেছে। চলে যে গেছে এটা জানি। ব্যাগে করে নিজের কাপড়-জামাও নিয়ে গেছে। ভাইয়া এখন কী হবে?

জহির সার্ট গায়ে দিচ্ছে। ঘর এখন অসহ্য লাগছে। বাইরে কোথাও যেতে হবে। হাসপাতালে যাওয়া খুবই দরকার, ফজলুর খোঁজ নিতে হবে। গত তিন দিন যাওয়া হয় নি।

মীনা বলল, ভাইয়া কোথায় যাও?

কাজে যাই। জরুরি কাজ আছে।

আমাকে পথে ফেলে চলে যাচ্ছ?

তুই পথে না। তুই আমার বাসায় আছিস এবং ভালো আছিস।

তুমি ফিরবে কখন?

জানি না কখন ফিরব।

রাত হবে?

হতেও পারে।

মীনা বলল, এর মধ্যে যদি টিয়া বাসের টিকিট নিয়ে ফিরে আসে।

যদি ফিরে আসে তোরা চলে যাবি। বাসায় তালা দিয়ে চাবি বাড়িওয়ালার কাছে রেখে চলে যাবি।

তুমি এ রকম কঠিন গলায় আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন?

মীনা আবার ফোস ফোস শুরু করল। টুনটুনিও দেরি করল না।

আর এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না। জহির উঠে দাঁড়াল।

ফজলু মুখের সামনে তিন দিনের একটা বাসি পত্রিকা ধরে শুয়ে আছে। জহিরকে দেখে সে পত্রিকা নামিয়ে বলল, আমাকে ধরাধরি করে একটু বসিয়ে দে। শুয়ে শুয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না। প্রকৃতি চায় না আমরা শুয়ে শুয়ে কথা বলি।

জহির ফজলুকে বিছানায় বসাতে বসাতে বলল, তোর নতুন থিওরি?

ফজলু বলল, থিওরি না হাইপোথিসিস। আমরা কখন শুই? ঘুমানোর জন্য শুই, কাজেই...

শরীরের অবস্থা কী?

ভালো না? ডাক্তাররা বলছে খারাপ ধরনের জন্ডিস। হেপাটাইটিস বি, সি, ডি এর কোনো একটা। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মৃত্যুর প্রস্তুতি কি নিতে শুরু করব?

ডাক্তার এমনভাবে তাকালো যেন পাগলা গারদের কোনো পেশেন্ট।

তোকে সে-রকমই দেখাচ্ছে।

ফজলু আগ্রহের সঙ্গে বলল, মৃত্যুর প্রস্তুতি কিন্তু আমি নিতে শুরু করেছি।

জহির বলল, সেটা কী রকম?

মনকে বুঝাচ্ছি আমাদের পৃথিবীর যে জগৎ সে জগতের চেয়ে মৃত্যুর পরের জগৎ অনেক ইন্টারস্টিং।

জহির বলল, মন বুঝেছে?

ফজলু বলল, না। এখনও না। তবে বার বার একই কথা বললে মন কন্ডিশন্ড হয়ে যাবে। তখন বুঝ মানবে।

জহির বলল, বুঝ মানলে তো ভালোই। এখন কি খাওয়া-দাওয়া করতে পারছিস, না-কি স্যালাইন চলছে?

স্যালাইন চলছে। মাঝখানে একবার জাউ ভাত দিয়েছিল। মুখে দিয়েই বমি করে দিয়েছি। ভালো করেছি না?

জহির জবাব দিল না। ফজলুর মুখ হাসি হাসি। যেন অতি মজাদার কোনো কথা বলেছে। জহির বলল, যে ডাক্তার তোকে দেখছেন তার নাম কী?

ফজলু বলল, তার নাম দিয়ে দরকার কী?

কথা বলতাম। তোর অসুখ কী? চিকিৎসা কী হচ্ছে?

কথা বলার কোনো দরকার নেই। তাদেরকে তাদের কাজ করতে দে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাজ করবে। একজন অন্যজনের কাজে ইন্টারফেয়ার করবে না। ডাক্তার করবে ডাক্তারের কাজ, আমি করব আমার কাজ।

এখন তোর কাজটা কী?

ফজলু আগ্রহের সঙ্গে বলল, আমার বর্তমান কাজ অদ্ভুত অদ্ভুত হাইপোথিসিস দাঁড় করানো। আমার আরেকটা হাইপোথিসিস শোন—

জহির বলল, হাইপোথিসিস শুনতে ইচ্ছা করছে না।

আহা শোন না, মজা পাবি। এই হাইপোথিসিসে মৃত্যুর পর আমরা আরেকটা গ্রহে চলে যাব। সেই গ্রহ পৃথিবীর চেয়ে অনেক সুন্দর। পৃথিবীতে যেমন রোগ-ব্যাধি আছে সেই গ্রহে নেই। সেই গ্রহ ব্যাধিমুক্ত গ্রহ। তবে সেখানে অভাব, অনটন আছে। মানসিক কষ্ট আছে। পৃথিবীর সব মানুষ যে সেই গ্রহে যেতে পারবে তা-না। অনেকের মডেল নষ্ট করে ফেলা হবে।

দ্বিতীয় যে গ্রহটাতে আমরা যাব সেখানেও মৃত্যু আছে। মৃত্যুর পর আমাদের স্থান হবে তৃতীয় গ্রহে। দ্বিতীয় গ্রহ থেকে তৃতীয় গ্রহে যাবার সময়ও একদল

মানুষ বাদ পড়ে যাব।

তৃতীয় গ্রহ হবে দ্বিতীয়টার চেয়ে বেটার। সেখানে ব্যাধি যেমন নেই, অভাব নেই। একটি ব্যাধি এবং অভাব মুক্ত জগৎ। তবে মানসিক কষ্ট আছে।

সেই জগৎ থেকে আমরা যাব চতুর্থ জগতে। সেই অপূর্ব জগতে কোনো কষ্টও নেই। সেখান থেকে যাত্রা হবে পঞ্চম জগতে।

জহির বলল, এর শেষ কোথায়?

ফজলু বলল, সর্বশেষ জগতটা হলো নবম জগৎ। সেখানে অল্প কিছু মানুষই বাস করবেন। তারা সবাই মুক্ত পুরুষ। মহান সাধু-সন্ত। তাঁরা সর্ব বিষয়েই মুক্ত। এমন কি সময়ের বন্ধন থেকেও মুক্ত। তারা তাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো জগতে যেতে পারবেন। কেউ কেউ ইচ্ছা করেই যাবেন। এই যে আমরা হঠাৎ হঠাৎ মহাপুরুষদের মত সাধু-সন্তের দেখা পাই তারা আসলে নবম জগতের মানুষ। স্ব-ইচ্ছায় আমাদের জগতে বাস করতে এসেছেন।

জহির বলল, এমন কোনো সাধু-সন্তের দেখা পেয়েছিস?

ফজলু বলল, একজনের দেখা তো অবশ্যই পেয়েছি। আমি নিজে, ঠাট্টা করছি না, এখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত।

জহির বলল, আজ উঠি।

ফজলু বলল, কাল আসবি?

না। কাল, পরশু, তরশু এই তিনদিন আসব না। সাভারের এক খামার বাড়িতে যাব। টাকার কুমির এক বুড়োর পোর্ট্রেট আঁকব।

বুড়োর গায়ের রঙ কি ফর্সা?

হুঁ।

তাহলে এক কাজ করিস ইয়েলো ওকার ব্যবহার করিস। ইয়োলো ওকারের সাথে সামান্য লাল রঙ দিবি। টাইটেরিয়াম হোয়াইট কিংবা জিংক অক্সাইড একেবারেই ব্যবহার করবি না। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখ।

আচ্ছা।

জহির পকেট থেকে পাঁচশ টাকার একটা নোট বের করে ফজলুর বালিশের নিচে রাখতে গেল। ফজলু বলল, টাকা রাখিস না। চুরি হয়ে যাবে। গতকালই বালিশের নিচ থেকে একশ টাকা চুরি হয়েছে।

খালি হাতে থাকবি?

হুঁ। আসছি নেংটা, থাকব নেংটা, যাব নেংটা।

জহির বাসায় ফিরল রাত দশটায়। মীনা তার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে বারান্দায় একা বসে আছে। জহিরকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

ভাইয়া ও ফিরে নাই।

জহির কিছু না বলে ঘরে ঢুকে গেল। মীনা তার পেছনে ঢুকল।

ভাইয়া এখন আমি কী করব?

কি আর করবি কান্না শুরু কর। মেয়েকে ঘুম থেকে তোল। সে কাঁদুক।

ভাইয়া তুমি পাষাণের চেয়েও খারাপ। সিমারের চেয়েও খারাপ। মীর জাফরের চেয়েও খারাপ।

জহির বলল, ভাত দে। আয় ভাত খাই।

মীনা ভাত বাড়ল। জহিরকে অবাক করে দিয়ে খেতেও বসল। জহির ভেবেছিল মীনা খাবে না। রাগ করে ভাত না খাওয়া তার ছোটবেলার অভ্যাস।

মীনা।

জি ভাইয়া।

তোর টিয়া টাকা-পয়সা, সিগারেট, কাপড়-চোপড় তোকে না জানিয়ে নিয়ে চলে গেছে এটা ঠিক না, তোকে জানিয়েই গেছে। তুই তাকে দশ হাজার টাকার একটা বান্ডেল দিয়ে দিবি টিকিট কেনার জন্যে এটা কখনও হবে না। ঘটনা কি বলতে চাইলে বল। বলতে না চাইলে বলতে হবে না।

মীনা মাথা নিচু করে বলল, ও ইন্ডিয়া যাবে। পাসপোর্ট নাই তো। বর্ডার ক্রস করে যাবে। যে বর্ডার পার করাবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে।

জহির বলল, ইন্ডিয়া যাবে কেন?

মীনা বলল, পালিয়ে থাকার জন্য যাবে। দেশে সে একটা ঝামেলায় পড়েছে।

কী ঝামেলা?

মীনা ক্ষীণ গলায় বলল, ওদের কারখানার কেন্টিনে একটা বাজে টাইপের মেয়ে কাজ করতো। এই মেয়েটাকে নিয়ে কি সব হয়েছে। শত্রুতা করে টিয়ার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। মূল আসামী তিনজন। টিয়া ঘটনার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। সারারাত সে ছিল আমার সাথে। আমার জ্বর। বেচারা সারারাত আমার মাথায় জলপট্টি দিয়েছে।

জহির বলল, রেপ কেইস না-কি?

মীনা হ্যাঁ না কিছুই বলল না।

জহির বলল, মেয়েটা মারা গেছে না বেঁচে আছে।

মীনা বলল, মারা গেছে।

আসামী চারজনের মধ্যে কয়জন ধরা পড়েছে।

তিনজনই ধরা পড়েছে। টিয়াকে শুধু ধরতে পারে নি। কীভাবে ধরবে? আল্লাহ আছে না আমাদের দিকে?

কিছু না বলে জহির খাওয়া শেষ করে উঠল। মীনা বলল, ভাইয়া পান খাও তোমার জন্য পান আনিয়ে রেখেছি।

জহির পান খেল। একটা সিগারেট ধরাল। মীনা তার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জহির বলল, তুই কি আরো কিছু বলবি?

মীনা বলল, তুমি কি আমাকে তোমার এখানে থাকতে দিবে?

জহির বলল, অবশ্যই। এখন যা, ঘুমাতে যা।

মীনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ভাইয়া আমার মেয়েটা তোমাকে খুব ভয় পায়। তুমি ওর ভয়টা ভাঙ্গায়ে দিও। তোমার সঙ্গেই তো সে থাকবে। এত ভয় পেলে চলবে?

হ্যালো ছন্দা।

হুঁ।

কেমন আছিস?

ভালো। কে?

গলা চিনতে পারছিস না?

ও আচ্ছা মৃন্ময়ী! তুই একেক সময় একেক স্বরে কথা বলিস চিনব কীভাবে?

মোবাইলের যুগে গলা চিনতে হয় না। কে টেলিফোন করেছে এম্নিতেই টের পাওয়া যায়। তার নাম উঠে। নাম্বার উঠে।

খেয়াল করি নি।

ঠিকই খেয়াল করেছিস। মাঝখান থেকে একটা ঢং করলি।

বিশ্বাস কর। খেয়াল করি নি। গড প্রমিজ।

কথায় কথায় গড নিয়ে আসিস কেন? উনাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না। উনাকে মিথ্যা কথার সাক্ষীও হতে হবে?

মৃন্ময়ী কী বলতে চাস বলে ফেল।

তোর পোর্ট্রেট করা হবে।

কী করা হবে?

পোর্ট্রেট। একজন আর্টিস্ট প্রতিদিন তোর বাসায় যাবেন। তুই এক ঘণ্টা করে সিটিং দিবি। তোর একটা পোর্ট্রেট হবে। আমার একটা হবে। এই দুইটা ছবি আমি আমার ঘরে টানিয়ে রাখব। রোববার পরীক্ষা শেষ হচ্ছে। সোমবার থেকে আর্টিস্ট যাবে।

ছন্দা বলল, কোনো আর্টিস্ট আমার বাসায় আসবে, আমি সিটিং দেব, এটা কখনও হবে না। বাবা আমাকে বাসা থেকে বের করে দেবেন।

কেন?

মৃন্ময়ী তুই একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছিস, আমি লোয়ার-মিডিল ক্লাসের মেয়ে। আমাদের বাসার ধ্যান-ধারণাও লোয়ার-মিডিল ক্লাস টাইপ।

লোয়ার-মিডিল ক্লাসের ধ্যান-ধারণা কী?

এরা সব কিছু সন্দেহের চোখে দেখে। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। আর্টিস্ট বাসায় এসে ঢুকলেই বাবা ভাববেন প্রেমের কোনো ব্যাপার। তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে যাবে।

তাহলে তুই এক কাজ কর, আমার বাড়িতে সিটিং দে।

তোর নতুন পাগলামীর মানে কী?

মানে হচ্ছে একজন বিখ্যাত আর্টিস্টকে দিয়ে তোর ছবি আঁকানো।

বিখ্যাত না কি!

অবশ্যই বিখ্যাত।

ম্যারিড?

মৃন্ময়ী বলল, ম্যারিড না আনম্যারিড এটা জেনে কী হবে? তুই তো তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস না।

ছন্দা বলল, এম্নি জিজ্ঞেস করলাম।

তোর বাবা যে তোকে কোথায় বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে তার কী হলো?

জানি না। মৃন্ময়ী আমি এখন রাখি, পরে টেলিফোন করব। একটু আগে বাবা সামনে দিয়ে গিয়েছেন। বেশিক্ষণ টেলিফোনে কথা বলতে দেখলে তিনি রেগে যান।

বেশিক্ষণ তো হয় নি।

ছন্দা লাইন কেটে দিয়ে সেট অফ করে দিলো।

মৃন্ময়ীর স্বভাব হচ্ছে একবার টেলিফোন করে থামে না। পর পর কয়েক বার করে। আবার টেলিফোনে কথা বলতে দেখলে বাসায় ভূমিকম্প হবে।

ছন্দার বাবা ইয়াকুব আলি একটা বীমা কোম্পানির হেড ক্লার্ক। বাড়ি ভাড়া এবং বেতন হিসেবে যা পান তা দিয়ে তাঁর সংসার চলে না। সন্ধ্যার পর তিনি দুটা টিউশ্যনি করেন। চার মেয়ের মধ্যে তিন জনেরই বিয়ে হয়েছে। ছন্দা বাকি আছে। বড় মেয়েটির ভালো বিয়ে হয়েছে। স্বামী ব্যবসা করে। বড় মেয়ে প্রতিমাসে বাবাকে তিন হাজার টাকা পাঠায়। ছন্দা ইউনিভার্সিটির খরচ নিজেই চালায়। বাসার কাছে একটা কোচিং সেন্টারের সে পার্ট টাইম টিচার।

ইয়াকুব আলির বয়স পঞ্চান্ন কিন্তু তাকে সত্তুর বছরের বৃদ্ধের মতো দেখায়। ইদানীং কোমরে ব্যাথা হয়েছে বলে সোজা হয়ে বসতে পারেন না। হাঁটার সময়েও সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটেন। তাঁর দাড়ি রাখার বাতিক আছে। আয়োজন করে দাড়ি রাখেন। দাড়ি সামান্য বড় হলে কেটে ফেলে দেন। আবার রাখেন। এখন তাঁর দাড়ি রাখার কাল চলছে। মুখ ভর্তি শাদা দাড়ি। তিনি বসে আছেন

ইজিচেয়ারে। ঢাকা শহরে আজকাল ইজিচেয়ার পাওয়া যায় না। পুরানো আসবাবের দোকান থেকে ইয়াকুব এই ইজিচেয়ার কিনেছেন। কাপড় ছিড়ে গিয়েছিল। নতুন কাপড় লাগিয়েছেন। ইজিচেয়ারটা তাঁর পছন্দের জিনিস।

ইয়াকুব আলি হাত ইশারায় ছন্দাকে ডাকলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, তোর মা কই?

ছন্দা বলল, বড় আপার বাসায় গেছেন।

একা গেছে?

বাবুল নিয়ে গেছে।

ইয়াকুব আলির সর্বশেষ সন্তানটি ছেলে। তার নাম বাবুল। সে দুবার ইন্টারমিডিয়েটে ফেল করে ঘরে বসে আছে। কিছু দিন কোনো এক কম্পিউটার স্কুলে যাওয়া-আসা করেছে, এখন সেটাও বন্ধ।

ছন্দা বলল, চা খাবে বাবা।

ইয়াকুব বললেন, চা খাব না। তোর মা যে হুট করে চলে গেল আমাকে বলে যাবে না? সংসারে কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না? ইচ্ছা হলো চলে গেলাম, ইচ্ছা হলো ফিরলাম।

বড় আপার ছেলের জ্বর, এই শুনে মা গেছেন।

জ্বর শুনেই তোর মা দৌড় দিয়ে চলে গেল। সে কি সিভিল সার্জন, জ্বরের চিকিৎসা করবে? তুই মোবাইল কিনেছিস কবে?

ছন্দা ভীত গলায় বলল, গত মাসে।

পয়সা খরচ করতে মায়া লাগে না? ইচ্ছা হলো কিনে ফেললাম?

নিজের জমানো টাকা দিয়ে কিনেছি।

নিজের টাকা আবার কী? সবই সংসারের টাকা। নিজের টাকা, নিজের মোবাইল এই সব শুনতে ভালো লাগে না। এই সব ক্ষুদ্র মনের পরিচয়। মনটাকে বড় করতে শেখ। তোর মা আসবে কখন?

দুপুরের আগেই আসবেন। বাবা আজ বাজার করবে না। ঘরে তেল নাই। মা বলে গেছেন তেল লাগবে।

এই মাসের চার তারিখ তেল কিনেছি, আজ বাইশ। আঠারো দিনে তেল শেষ হয়ে গেল? তোর মা কি তেল দিয়ে গোসল করে?

ছন্দা চুপ করে আছে। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছে না আবার চলে যেতেও পারছে না।

ইয়াকুব আলি বললেন, ঘরে পোলাওর চাল আছে?

মনে হয় না।

মনে হওয়া-হওয়ি কিছু না, যা বলার সিওর হয়ে বলবি। রাতে দুজন গেস্ট

খাবে। তোর সঙ্গে যে ছেলের বিয়ের আলাপ করছি তার বড় মামা আর মেজো মামা সন্ধ্যার পর আসবেন। পছন্দ হলে সম্ভাবনা আছে যে আজই আংটি পরিয়ে দেবে। পেত্নী সেজে ওদের সামনে পড়বি না। আবার রাজকন্যাও সাজবি না। মুখে হালকা পাউডার আর ঠোঁটে লিপস্টিক। বুঝতে পারছিস?

পারছি।

মোবাইল কত দিয়ে কিনলি। দেখি জিনিসটা।

ছন্দা বাবার হাতে মোবাইল দিতে দিতে বলল, চার হাজার।

ইয়াকুব আলি বললেন, এত দাম! চার হাজারেও তো শেষ না। প্রতি মাসে চার্জ আছে, অমুক আছে, তমুক আছে। এটা অন করে কীভাবে?

ছন্দা অন করে দিল।

টেলিফোন করতে হয় কীভাবে?

ছন্দা দেখাচ্ছে। ইয়াকুব আলি আগ্রহ নিয়ে দেখছেন। ছন্দা বলল, বাবা এই মোবাইলটা তুমি রেখে দাও।

আমি এইসব দিয়ে কী করব? কাকে টেলিফোন করব? হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পোলাওয়ের চাল আছে কি-না দেখতে বললাম না?

ইয়াকুব আলি মেয়ের টেলিফোন পকেটে রেখে দিলেন। তিনি যখন কাঁচা বাজারে আলু কিনছেন তখন তাঁর পকেটের টেলিফোন বেজে উঠল। মৃন্ময়ী বলল, হ্যালো ছন্দা।

ইয়াকুব আলি বললেন, আমি ছন্দার বাবা।

মৃন্ময়ী বলল, চাচা স্লামালিকুম।

ইয়াকুব আলি বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম।

চাচা কেমন আছেন?

ভালো আছি। মা তোমার পরিচয়?

আমি আর ছন্দা এক সঙ্গে পড়ি। আমার নাম মৃন্ময়ী।

ইয়াকুব আলি বললেন, ওর টেলিফোনটা আমি ভুল করে পকেটে নিয়ে বাজারে চলে এসেছি।

মৃন্ময়ী বলল, ভালো করেছেন। মোবাইল নিয়ে এসেছেন বলেই আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো। কথা হলো।

ইয়াকুব আলি মৃন্ময়ী নামের মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গিতে মোহিত হয়ে গেলেন। কী ভদ্র ব্যবহার! তিনি বললেন, ছন্দার যে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই জান।

জি জানি।

ছেলে ব্যাংকে কাজ করে। ম্যানেজার। চেহারা ভালো। বংশ ভালো।

পুরোনা ঢাকায় তাদের পৈতৃক দোতলা বাড়ি আছে।

বাহ্ ভালো তো।

ছেলের দুই মামা আজ দেখতে আসবেন। তার জন্যেই বাজারে এসেছি। মেয়ে পছন্দ হলে তারা আজই আংটি পরিয়ে দেবেন। সে রকম কিছু অবশ্যি তারা বলেন নাই। এটা আমার অনুমান। দেখি আল্লাহ কি ঠিক করে রেখেছেন। মা একটু দোয়া করবে।

অবশ্যই করব। চাচা আজ রাতে যে ওদের খাওয়াবেন তার মেনু কী?

গরীব মানুষের মেনু। শাদা পোলাও, মুরগির কোরমা আর খাসির মাংসের রেজালা।

দই মিষ্টি থাকবে না?

ভালো কথা মনে করেছ। দই-মিষ্টির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। দুটা রাখা যাবে না। হয় দই কিংবা মিষ্টি।

তাহলে বরং দই রাখুন। রিচ ফুড খাওয়ার পর দই খেতে ভালো লাগে।

মা শোন, তুমিও চলে আস। রাতে ছন্দার সঙ্গে বসে খাবে।

মৃন্ময়ী বলল, অবশ্যই আসব। চাচা আমি কি সঙ্গে করে দু-একটা আইটেম নিয়ে আসতে পারি? যদি অনুমতি দেন।

ইয়াকুব আলি ছন্দার এই বান্ধবীর ভদ্রতায় মুগ্ধ হলেন। আজ-কালকার মেয়েদের ভেতর থেকে এ ধরনের ভদ্রতা উঠেই গেছে।

ছন্দা নিজের ঘরে বসে আছে। একটু আগে বাথরুমে ঢুকে কিছুক্ষণ কেঁদেছে। চোখের পানিতে কাজল লেপ্টে গেছে। আবার কাজল দিবে। মুখে হালকা পাউডার দিতে হবে। বাবার কথামতো ঠোঁটে লিপস্টিক। পেত্নী সাজা যাবে না। আবার রাজকন্যাও সাজা যাবে না।

বরের দুই মামার আগমন উপলক্ষে ছন্দার বোনরা চলে এসেছে। বাড়ি ভর্তি মানুষ। ইয়াকুব আলি স্ত্রীর উপর যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন। খবর দিয়ে দুনিয়ার মানুষ আনার দরকার কি! এরা সবাই খেয়ে যাবে। সেই আয়োজন কি আছে। না-কি সেই আয়োজন করা সম্ভব? একটা মুরগির কোরমা। খাসির মাংস এক কেজি। পোলাওয়ের চাল অবশ্যি বেশি এনেছেন। পোলাও রান্না করা যাবে। পোলাও খাবে কী দিয়ে? আলু ভর্তা দিয়ে?

ছন্দার বড় বোনের নাম শিউলী। বিয়ের আগে রোগা-পাতলা ছিল। এখন প্রতিদিন প্রস্থ বাড়ছে। সে ছন্দার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। গলা খাদে

নামিয়ে বলল, এই তোর সঙ্গে যে ছেলের বিয়ে হচ্ছে তার না-কি আগে একটা বউ ছিল?

ছন্দা চমকে উঠে বলল, জানি না তো। কে বলেছে?

তোর দুলাভাই বলল, সে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল।

ছন্দা বলল, বাবা কী বললেন?

বাবা হ্যাঁ-না কিছুই বলেন নি। চুপ করে ছিলেন। বাবা ঐ ছেলের মধ্যে কি দেখেছেন কে জানে। কুস্তীগিরের মতো ছেলে।

ছন্দা বলল, বাবা মেয়ে পার করতে চাচ্ছেন। আর কিছু না।

শিউলী বলল, ইউনিভার্সিটিতে এত ছেলে, একজনকে খুঁজে বের করতে পারলি না, যাকে বিয়ে করা যায়?

ছন্দার চোখে আবার পানি এসে গেছে।

হইচই শুনা যাচ্ছে। দুই মামা এসেছে। মামার সঙ্গে ছেলেও এসেছে। ছেলের এক বন্ধুও সঙ্গে আছে। তার আসার কথা ছিল না। সঙ্গে মিষ্টির প্যাকেট আছে। মিষ্টির প্যাকেট ছাড়া আরও কি সব প্যাকেট দেখা যাচ্ছে।

দুই মামাই ছন্দার জন্যে শাড়ি এনেছেন। দুটা শাড়িই ভালো। একটা রাজশাহী সিল্ক আরেকটা জামদানী। বড় মামা ছন্দার হাতে আংটি পরিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করে অনেক কথাই বললেন। কোনো কথা ছন্দার কানে ঢুকল না। তার ইচ্ছা করছে দাঁত দিয়ে কেটে শাড়ি দুটা ছিড়ে টুকরা টুকরা করে।

ইয়াকুব আলি তাঁর ইজিচেয়ারে হতাশ হয়ে শুয়ে আছেন। বাবুলকে আরেকটা মুরগি এবং খাসির মাংস আনতে পাঠানো হয়েছে। এতেও হবে কি-না কে জানে।

অতিথিদের খাবার দেয়ার আগে আগে মৃন্ময়ী চলে এল। তার গাড়ি থেকে প্যাকেটের পর প্যাকেট খাবার নামছে। খাবার এসেছে হোটেল সোনারগাঁও থেকে। ইয়াকুব আলি একবার অবাক হয়ে মৃন্ময়ীকে দেখছেন একবার খাবার দেখছেন।

বরের বড় মামা ইয়াকুবকে বললেন, বেয়াই সাহেব! এই মেয়ে কে?

ইয়াকুব বললেন, ছন্দার বান্ধবী। ঘনিষ্ট বান্ধবী।

ছন্দা মৃন্ময়ীকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। ছন্দা হাউমাউ করে কাঁদছে। মৃন্ময়ী বলল, কী সমস্যা বল দেখি?

ছন্দা সমস্যা বলছে না, কেঁদেই যাচ্ছে।

আলিমুর রহমান বড় একটা কাঠের চেয়ারে পা তুলে জবুথবু ভঙ্গিতে বসে আছেন। তাঁর পরনে শাদা রঙের হাফ-পাজামা হাফ প্যান্ট জাতীয় একটা জিনিস। খালি গা। চেয়ারটা নিমগাছের নিচে বসানো। তিনি নিমগাছের পাতা ভেদ করে আসা রোদ গায়ে মাখছেন। তিনি আগ্রহ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ানো যুবকটির কাণ্ডকারখানা দেখছেন। যুবকটি তাঁর পোর্ট্রেট আঁকছে।

বেশ বড়-সড় একটা ইজেল তাঁর সামনে। থালার মতো একটা বাটিতে রঙ। যুবকের হাতে ব্রাশ। সে দ্রুত বোর্ডে রঙ ঘষছে। আলিমুর রহমান বললেন, তোমার নাম কী?

যুবক তাঁর দিকে না তাকিয়েই বলল, স্যার! আমার নাম জহির।

নামের আগে আহম্মদ, মুহম্মদ এইসব কিছু নাই?

জি না।

তুমি তো আমার দিকে তাকাচ্ছই না। না তাকিয়ে কি কাকের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং আঁকছ।

যুবক মুখ তুলে তাকাল। আবার রঙ লাগাতে লাগাতে বলল, মাঝে মাঝে আপনাকে দেখছি।

আমি যেভাবে বসেছি তাতে কি তোমার সমস্যা হচ্ছে?

জি না।

আমাকে দেখে মনে হচ্ছে না চেয়ারে একটা শাদা ব্যাঙ বসে আছে? সামনেই পুকুর। শাদা ব্যাঙটা এক্ষুনি লাফ দিয়ে পুকুরে পড়বে।

এ রকম মনে হচ্ছে না।

আমাকে বসে থাকতে দেখলে আমার নাতনীর এ রকম মনে হয়। মৃন্ময়ীর কথা বলছি।

জি বুঝতে পারছি।

এতক্ষণ কী আঁকলে আমাকে দেখাও।

যুবক বোর্ড উল্টে দেখাল। গাঢ় হলুদ রঙ। লম্বা লম্বা রঙের কিছু টান। আলিমুর রহমান বললেন, এই সব কী?

স্যার রঙ। ইয়োলো ওকার।

আমার ছবি কোথায়?

ছবি আসবে। প্রথমে রঙ আনছি।

ঠিক আছে আঁকতে থাক। মাঝে মাঝে আমাকে দেখাবে।

জি স্যার। দেখাব। আপনি যখনই বলবেন তখনই দেখাব। স্যার আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি?

আলিমুর রহমান বললেন, না। আমি তোমার বাপের চেয়েও বেশি বয়সের একজন বৃদ্ধ। আমার সামনে সিগারেট কেন খাবে? তোমার কি ছবি আঁকার সময় সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস?

জি।

বদঅভ্যাস দূর কর। বাবা-মা আছেন?

জি না।

ভাই-বোন কী?

একটাই বোন।

বোনের বিয়ে হয়েছে?

জি।

বাচ্চা-কাচ্চা আছে?

একটা মেয়ে আছে।

আমি যে কথা বলছি তোমার ছবি আঁকতে অসুবিধা হচ্ছে?

জি না।

কতটুকু আঁকা হয়েছে দেখাও।

জহির আবার দেখাল। আলিমুর রহমান তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। নতুন কিছু করা হয়নি। আরও কিছু রঙ ঘসা হয়েছে। এই যুবক কি আসলেই ছবি আঁকা জানে? এতক্ষণ ধরে রঙ লাগানো হচ্ছে। চোখ নাক মুখ কিছু-একটা তো আসবে।

তোমার বোনের স্বামী কী করেন?

খুলনার এক কারখানায় কাজ করত, এখন করে না।

বেকার?

স্যার সে এখন পলাতক।

পলাতক কেন?

সে আরো কয়েক জন মিলে একটা মেয়েকে রেপ করেছিল। মেয়েটা মারা গেছে। পুলিশে মামলা চলছে। সে পালিয়ে গেছে ইন্ডিয়া।

তোমার বোন কোথায়?

আমার সঙ্গে থাকে।

বোনের মেয়েটার বয়স কত?

তিন বছর।

তার নাম কী?

টুনটুনি।

তোমার বোনের নাম কী?

মীনা।

তোমার বোনের নাম মীনা।

জি স্যার।

আমার মায়ের নাম ছিল মীনা। আমার বাবা অবশ্য আমার মাকে মিনু ডাকতেন। তোমার বোনের স্বামী তার স্ত্রীকে কী ডাকে? মীনা ডাকে নাকি মিনু ডাকে।

আদর করে ময়না ডাকে।

তোমার নাম জহির তাই না?

জি স্যার।

ইচ্ছা করলে তুমি সিগারেট খেতে পার।

জহির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। কোনো রকম সঙ্কোচ ছাড়া সিগারেট ধরাল। তার কাজ সে বন্ধ করল না। ঠোঁটে সিগারেট রেখেই সে ব্রাশ টানছে। আলিমুর রহমান বললেন, তোমাকে সিগারেট খাবার অনুমতি কেন দিলাম জান?

জি না।

তুমি তোমার পারিবারিক একটা লজ্জার কাহিনী কোনো রকম সঙ্কোচ ছাড়া বলেছ দেখে আমার ভালো লেগেছে। তোমার বোনের নাম মীনা শুনেও ভালো লেগেছে। মীনা নাম শুনে আমার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। মা'র কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার বোনের স্বামী বদমাইশটার নাম কী?

সবুজ।

সবুজ কি তার স্ত্রীকে মারধোর করত?

জি না।

আমার বাবা আমার মাকে মারতেন। ছেলে-মেয়েদের চোখের সামনেই মারতেন। আমি আমার মাকে শেষ মার খেতে দেখি যখন আমার বয়স তের। বাবা মা'র চুলের মুঠি ধরে মারছেন। ছেচড়াতে ছেচড়াতে উঠানে নিয়ে

এসেছেন। মা'র শাড়ি খুলে গেছে। তিনি তিনি... সেই যে আমি ঘর থেকে বের হলাম। আর ফিরে যাই নি।

জহির বলল, আপনার বাবা-মা'র সঙ্গে আর আপনার দেখা হয় নাই?

আলিমুর রহমান জবাব দিলেন না। জহির দেখল বৃদ্ধের দুই চোখ ভিজে উঠেছে। কঠিন চোখ হঠাৎ ভিজে গেলে অন্য এক ধরনের কোমলতা চলে আসে। জহির তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। তাকে এই চোখ আঁকতে হবে। মমতায় আর্দ্র চোখ।

জহির!

জি স্যার!

তুমি চলে যাও। আজ আর না।

জহির বলল, স্যার কি একটা সিগারেট খাবেন?

আলিমুর রহমান ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দাও একটা খাই।

আমার কিন্তু সস্তা সিগারেট।

আলিমুর রহমান বললেন, আমিও সস্তা মানুষ, অসুবিধা নেই। আমার পুত্র দামী। দামী এবং মহাজ্ঞানী শিল্পবোদ্ধা। সব সময় মুখের সামনে বই।

জহির, তোমার মাছ মারার শখ আছে?

জি না।

তোমার কীসের শখ?

আমার কোনো শখ নেই।

আলিমুর রহমান বললেন, আমার বাবার শখ ছিল খাওয়ার। খেতে পলেই হলো। আর কিছু না। মা মাঝে-মধ্যে মুরগি রান্না করতেন। বাবা কী করতেন শোন। খেতে বসার সময় পুরো পাতিলটা নিয়ে বসতেন। তাঁর খাওয়া শেষ হবার পর যদি কিছু থাকতো আমরা খেতাম। বেশির ভাগ সময় কিছু আলু আর ঝোল থাকতো। ঠিক আছে আজ যাও। এখন আমি আমার মহাজ্ঞানী পুত্রকে একটা চিঠি লিখব। তুমি ঢাকায় যাবে কীভাবে?

বাসে যাব।

ম্যানেজারকে বল গাড়ি দিয়ে যেন পৌঁছে দেয়। আবার যখন আসবে ম্যানেজারকে টেলিফোন করবে। সে গাড়ি পাঠিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে। পাঁচটা মিনিট কি অপেক্ষা করতে পারবে?

অবশ্যই পারব।

তাহলে পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা কর। গাড়ির ড্রাইভার আমার মহাজ্ঞানী পুত্রের কাছে একটা চিঠিও নিয়ে যাবে। চিঠি লিখতে লাগবে এক মিনিট।

আলিমুর রহমান এ ফোর সাইজ একটা কাগজে বড় বড় করে লিখলেন— গাধা। খামের উপর ছেলের নাম ঠিকানা সুন্দর করে লিখলেন। তাঁর মুখে বিজয়ীর হাসি। চিঠি পড়ার পর পুত্রের মুখের ভাব কী হয় এই ভেবেই তাঁর আনন্দ হচ্ছে।

শাহেদুর রহমান লাইব্রেরি-ঘরে পড়ার চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর এই বিশেষ পড়ার চেয়ারের ডিজাইন তিনি নিজে করেছেন। একবার তৈরি হবার পর কয়েক দফা সংস্কার করতে হয়েছে। কিছু কাজ এখনো বাকি আছে। এই চেয়ারটা অনেকটা ডেন্টিস্টদের চেয়ারের মতো। হাত দিয়ে বই ধরতে হয় না। বই রাখার আলাদা স্ট্যান্ড আছে। স্ট্যান্ডে বল বিয়ারিং লাগানো। চোখে আরাম হয় এমন অবস্থায় বইকে রাখা যায়। বসার অবস্থানও বদলানো যায়।

শাহেদুর রহমান এখন পড়ছেন পপুলার সায়েন্সের বই। বইয়ের লেখকের মতে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা হলোগ্রাফিক ছবি ছাড়া কিছুই না। মানুষ হচ্ছে হলোগ্রাফিক ইমেজের অবজারভার। ভারতীয় মুণি-ঋষিরা জগৎকে মায়া বলতেন। পদার্থবিদ্যার এই অধ্যাপকও জগৎকে মায়া বলছেন। তবে একটু অন্যভাবে।

শাহেদুর রহমানের কঠিন নির্দেশ আছে পড়াশোনার সময় তাকে কেউ বিরক্ত করতে পারবে না। Extreme Emergency-তেও না। পড়াশোনা ব্যাপারটাই Extreme Emergency. এরচে' বড় ইমার্জেন্সি হতে পারে না।

বিপদে পরেছে ফরিদ। একটা ঘটনা ঘটেছে। স্যারকে ঘটনা জানানো উচিত। কীভাবে জানাবে বুঝতে পারছে না। ব্যাংক থেকে দু লাখ টাকার একটা চেক ফেরত এসেছে। চেকে সীল দেয়া, পর্যাপ্ত অর্থ জমা নেই। এটা যে কত বড় দুঃসংবাদ সে জানে। স্যার কি জানেন?

ফরিদ চেয়ারের কাছে এসে কাশল। শাহেদুর রহমান বিরক্ত চোখে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, কী চাও?

ফরিদ হড়বড় করে বলল, সকালে যে চেকটা নিয়ে ব্যাংকে গিয়েছিলাম সেই চেক ফেরত দিয়েছে।

শাহেদুর রহমান বললেন, সিগনেচার মিলে নাই? দুই দিন পর পর আরেক যন্ত্রণা। আরেকটা চেক লিখে আন। সাইন করে দেই।

ফরিদ ভীত গলায় বলল, ব্যাংক বলছে ফান্ড নেই।

শাহেদুর রহমান অবাক হয়ে বললেন, ফান্ড নেই মানে কী? ফান্ড গেল কোথায়? গত ছয় মাসের স্টেটমেন্ট নিয়ে এসো।

স্টেটমেন্ট এনেছি স্যার। দেখবেন?

এখন দেখব না, পরে।

টেবিলে রেখে যাব?

তোমার কাছে রাখ, আমি পরে দেখব। আর দয়া করে একটা জিনিস মনে রাখবে— আমি যখন পড়তে বসব তখন আমার ঘরেই ঢুকবে না।

স্যার ভুল হয়েছে।

শাহেদুর রহমান পড়ায় মন দিলেন। লেখক বলছেন যখন ইলেকট্রনকে অবজার্ভ করা হয় তখন সে পার্টিকেল। যখন তাকে অবজার্ভ করা হয় না তখন সে তরঙ্গ। ইলেকট্রনের এই দ্বৈত সত্তা।

ম্যানেজার ফরিদ মৃন্ময়ীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও আরেক সমস্যা দরজা যখন বন্ধ থাকবে তখন দরজায় টোকা দেয়া যাবে না। দরজা খোলা থাকলেই টোকা দেয়া যাবে। দরজা বন্ধ।

ফরিদ দরজায় টোকা দিল। মৃন্ময়ী বলল, কে?

ফরিদ বলল, আপা আমি ম্যানেজার ফরিদ।

কী চান?

একটা বড় সমস্যা হয়েছে আপা! স্যার বই পড়া ধরেছেন স্যারকে বলতেও পারছি না।

আমাকে বললে কি লাভ হবে?

ফরিদ জবাব দিল না। কী জবাব দেবে বুঝতেও পারছে না। মৃন্ময়ী বলল, আসুন। ভেতরে আসুন।

ফরিদ আরও হকচকিয়ে গেল। সত্যি কি তাকে ভেতরে যেতে বলছে? নাকি সে ভুল শুনছে। আপার ঘরে সে আগে কখনও ঢুকে নি।

আপা ভেতরে আসতে বলছেন?

হ্যাঁ।

ফরিদ অতি সাবধানে ঢুকল। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের শোবার ঘরে মানুষের পোষাক-আষাকের ঠিক থাকে না। আপা কী অবস্থায় আছেন কে জানে।

মৃন্ময়ী বলল, বলুন আপনার সমস্যা। আগের ব্যাপার না তো? আর্টিস্টকে ক্যাশ টাকা দিতে হবে?

সে রকম কিছু না। ব্যাংকে স্যারের কোনো টাকা নেই। চেক ফেরত এসেছে।

একদিন না একদিন চেক ফেরত আসবেই, এটা তো জানতেন। জানতেন

না? দাদাজান সাপ্লাই লাইন অফ করে দিয়েছেন। তিনি যে এই কাজটা করবেন তাও তো আপনার জানা থাকার কথা।

ফরিদ এখনও মাথা নিচু করেই আছে। মৃন্ময়ী বলল, আমাকে এসব বলে কী হবে? যাকে বলার তাকে বলুন।

জি আচ্ছা।

মৃন্ময়ী শান্ত গলায় বলল, আচ্ছা ফরিদ সাহেব প্রতিদিন নিয়ম করে রাত সাড়ে এগারোটার সময় আপনি কি একবার আমাকে টেলিফোন করেন?

ফরিদ চমকে মুখ তুলে তাকাল। তার দৃষ্টি ঘোলাটে। কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। পা সামান্য কাঁপছে।

মৃন্ময়ী খাটে আধশোয়া হয়ে আছে। তার হাতে বই, আগামীকাল একটা পরীক্ষা আছে। প্রিপারেশন খুবই ভালো। আর না পড়লেও হয়। তারপরেও একবার চোখ বুলিয়ে যাওয়া। মৃন্ময়ী বইয়ের পাতা উল্টাতে-উল্টাতে বলল, রাত সাড়ে এগারোটায় আমার টেলিফোন বেজে উঠে। আমি কয়েকবার হ্যালো হ্যালো বলতেই লাইন কেটে যায়।

ফরিদ বিড়বিড় করে বলল, আপা আমার এত সাহস নাই।

তাহলে ঠিক আছে। কিছু মনে করবেন না।

আমি কিছু মনে করি নাই।

That's good. আচ্ছা আপনি যান।

ঘর থেকে দ্রুত বের হবার সময় দরজার চৌকাঠে মাথা লেগে ফরিদের কপাল ফুলে গেল। চারতলায় উঠার সময় একবার সিঁড়িতে পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে পড়ে গেল।

মৃন্ময়ীদের বাড়ির নিয়ম হলো রাতের খাবার সবাই এক সঙ্গে খাবে। গল্প করতে করতে খাওয়া। এমন যদি হয় একজন কেউ খাবে না। শরীর খারাপ। তাকেও উপস্থিত থাকতে হবে। খাবার টেবিলে দেয়ার পর শাহেদুর রহমান গম্ভীর ভঙ্গিতে বলবেন— Oh God! Thank you for the food.

আমেরিকায় পড়াশোনা করতে গিয়ে শাহেদুর রহমান এই জিনিস শিখে এসেছেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছে God-এর অসীম করুণার কথা প্রতিদিন একবার হলেও মনে করা মানসিক স্বাস্থের জন্যে দরকার।

আজকের খাবার টেবিলে শায়লা বসেন নি। তিনি নিয়ম ভঙ্গ করে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। চায়নিজ হার্বাল মেডিসিন শেষপর্যন্ত কাজ করে

নি। শায়লার অ্যালার্জিক অ্যাটাক হয়েছে। মুখের উপর নেবুলাইজার নিয়ে তিনি আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর দেখাশোনা করছে একজন নার্স। নার্সের নাম মালতী রাণী। তাকে প্রায়ই এ-বাড়িতে আসতে হয়।

শাহেদুর রহমান প্রার্থনাপর্ব শেষ করে বললেন, কী খবর বিবি?

মৃন্ময়ী বলল, আমার খবর ভালো। তোমার খবর কী?

শাহেদুর রহমান বললেন, দারুণ একটা বই পড়ছি। Holographic Universe. ওয়ান থার্ড পড়ে ফেলেছি। বইটা এত ইন্টারেস্টিং যে ভাত খেতে আসার ইচ্ছাও হচ্ছিল না।

মৃন্ময়ী বলল, ব্যাংকে তোমার না-কি কোনো টাকা নেই?

শাহেদুর রহমান বললেন, খাওয়ার টেবিলে ব্যাংকের আলোচনাটা না করলে হয় না?

হ্যাঁ হয়।

শাহেদুর রহমান বললেন, খাওয়ার টেবিলে আলোচনা হবে হালকা। জোকস চলতে পারে। তুই একটা জোক বল তো।

মৃন্ময়ী বলল, তুমি বল আমি শুনি।

শাহেদুর রহমান খাওয়া বন্ধ করে জোকস মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন। মৃন্ময়ীও খাওয়া বন্ধ করে অপেক্ষা করছে।

শাহেদুর রহমান বললেন, জোকস-এর সমস্যা হলো একজন একটা বললে অন্য আরেকটা মনে পড়ে। এক ধরনের চেইন রিএকশান।

মৃন্ময়ী বলল, বাবা শোন দাদাজান কিন্তু তোমার জন্যে ভালো একটা জোকের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন।

কী রকম?

সেটা এখন বলব না। খাবার টেবিলে ভারী আলোচনায় যাব না। তবে তুমি তোমার বাবার জোকে খুবই আনন্দ পাবে!

শাহেদুর রহমানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মজার একটা জোক মনে পড়েছে। সামান্য অশ্লীলতা আছে তবে মেয়ের সামনে বলা যায়। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন আরেকটা মনে করতে যেটা কোনো দ্বিধা ছাড়াই মেয়েকে শুনানো যায়।

মৃন্ময়ী ঘুমুতে যাবার আগে মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি অনেকটা সামলে উঠেছেন। নার্স মালতী রাণী রাতে থেকে যাচ্ছে, যদি রাতে সমস্যা হয়।

শায়লা বললেন, বিন্তি মেয়েটা কেমন কাজ করছে?

মৃন্ময়ী বলল, ভালো। মেয়েটা বুদ্ধিমতী।

শায়লা বললেন, মেয়েটাকে বিদায় করে দে।

মৃন্ময়ী বলল, আচ্ছা।

শায়লা বললেন, কালই বিদায় কর।

মৃন্ময়ী বলল, কারণটা বল।

শায়লা বললেন, কারণ তুই ভালো করেই জানিস।

আমি জানি না।

শায়লা বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাগ সামলানোর চেষ্টা বুঝা যাচ্ছে। শায়লা চাপা গলায় বললেন, কারণ তুই জানিস না?

না।

তুই নিজে তোর দাদাজানের সঙ্গে বসে শলাপরামর্শ করে এই মেয়েকে বাড়িঘর লিখে দিতে বলিস নি। আমি ম্যানেজার কালামের থেকে খবর পেয়েছি।

মৃন্ময়ী স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ও এই কথা!

শায়লা বললেন, তোর কাছে এটা খুবই স্বাভাবিক কথা!

দাদাজান তাঁর নিজের টাকা নিজের জায়গা-জমি কাকে কী দেবেন সেটা তাঁর ব্যাপার।

শায়লা বললেন, একটা কাজের মেয়ে তার জন্যে বারিধারায় চারতলা বাড়ি?

মৃন্ময়ী বলল, জিনিসটা অন্যভাবে দেখ। মনে কর এই মেয়েটা হঠাৎ একটা লটারির টিকেট পেয়ে গেছে। অনেকেই তো লটারির টিকেট পায়। পায় না?

তোর দাদাজান একটা আধাপাগল মানুষ। তোর দায়িত্ব বুঝিয়ে-সুজিয়ে পাগলামী সহনীয় পর্যায়ে রাখা। তুই করছিস উল্টোটা। তোর লাভটা কী হচ্ছে?

মৃন্ময়ী বলল, আমার 'Fun' হচ্ছে। আমার জীবনটা খুবই শুকনা ধরনের। এ রকম 'Fun' আমার জন্যে দরকার।

ফুটপাথে ফুটপাথে যখন ঘুরবি তখন ফান থাকবে?

অবশ্যই থাকবে তখনকার ফান অন্য ধরনের হবে। সারাদিন খাওয়া নেই হঠাৎ একবেলা খাওয়া জুটল। মা তুমি কি জান হোটেল সোনারগাঁওয়ের সিস্টেম হচ্ছে গেস্টদের উচ্ছিষ্ট খাবার তারা ফেলে দেয় না। সব জড় করে ভিখিরিদের দিয়ে দেয়। ভিখিরিরা খুব আনন্দ নিয়ে সেই সব খাবার খায়। আমি প্ল্যান করে রেখেছি একদিন ঐ খাবারও খাব।

শায়লা বললেন, ঘর থেকে বের হ!

মৃন্ময়ী বলল, আরও কিছুক্ষণ গল্প করি। আজ আমি গল্প করার মুডে আছি।

বাবার কাছ থেকে খুবই ফানি একটা জোক শুনে এসেছি। তুমি শুনবে? হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে যাবে।

শায়লা হাত দিয়ে ইশারা করলেন যেন মৃন্ময়ী চলে যায়।

মৃন্ময়ী নিজের ঘরে চলে এল। রাত বাজছে এগারোটা। তার ঘুম পাচ্ছে। তবে সে এখন ঘুমাবে না। সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আজও টেলিফোনটা আসে কি-না দেখা দরকার, তার ধারণা আজ আর আসবে না। কোনো রাতেই আর আসবে না।

বিন্তি চা নিয়ে এসেছে। হালকা লেবু চা। ঘুমুতে যাবার আগে মৃন্ময়ীর চা খাবার অভ্যাস আছে। এখন এক কাপ খাবে। বারোটার সময় বাতি নিভিয়ে এক কাপ খাবে।

বিন্তি বলল, ম্যানেজার সাহেবের কী জানি হইছে।

মৃন্ময়ী বলল, কী হয়েছে?

খুব কানতাছে।

কান্না তো ভালো। বেশি কাঁদলে চোখ সুন্দর হয় এটা জান?

জি না আপা।

বাংলাদেশের মেয়েদের চোখ এত সুন্দর কেন? তারা বেশি কাঁদে এই জন্যেই সুন্দর। আমাকে টেলিফোনটা দাও।

মৃন্ময়ী ছন্দাকে টেলিফোন করল। টেলিফোন ধরলেন ছন্দার বাবা ইয়াকুব। গম্ভীর গলায় বললেন, হ্যালো।

মৃন্ময়ী বলল, চাচা স্লামালিকুম। আমি মৃন্ময়ী।

ইয়াকুব বললেন, গলা শুনেই বুঝতে পেরেছি। মা কেমন আছ?

ভালো আছি।

ছন্দার সঙ্গে কথা বলবে তো। ও ঘুমায়ে পড়েছে। ডেকে তুলে দেই?

ডেকে তুলতে হবে না। এত সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ল কেন চাচা? কাল পরীক্ষা।

আর পরীক্ষা। সকাল থেকেই কান্নাকাটি। চোখে পানি নাকে পানি।

কেন?

আমাকে ভেঙ্গে কিছু বলছে না। আমার মেয়েরা এবং আমার স্ত্রী— এরা কেউ কখনও আমাকে ভেঙ্গে কিছু বলে না। কিছুটা বলে বাকিটা অনুমান করে নিতে হয়।

অনুমান করে কী পেলেন? ছন্দার এত কান্নাকাটি কীসের?

ছেলে পছন্দ হয় নাই। এরচে' ভালো ছেলে আমি পাব কোথায়? আমার কি ভালো ছেলের কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ আছে? যে অর্ডার দিব, সেই অর্ডার

মতো পাত্র ডেলিভারী হবে।

মৃন্ময়ী বলল, সেটা তো সম্ভব না।

ইয়াকুব বললেন, এখন মা তুমি বিবেচনা কর, ছেলের একটাই দোষ আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রী গত হয়েছে। সেই পক্ষের একটা মেয়ে আছে। এই মেয়েকে তো ছন্দার পালতে হবে না। মেয়ে থাকে তার নানীর বাড়িতে।

মৃন্ময়ী বলল, পালতে হলে পালবে। সংসারে সৎ ছেলে-মেয়ে থাকতেই পারে, সব কিছু মানিয়ে নিয়েই সংসার।

ইয়াকুব বললেন, তুমি এখন যে কথাটা বললে এমন কথা কেউ বলে না। এটা হলো জ্ঞানের কথা। মাগো তোমাকে যে আমি মা ডাকছি, অন্তর থেকে ডাকছি এটা বুঝতে পারছ?

পারছি।

এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি খুবই ভালো লাগছে। মা তুমি শুনলে অবাক হবে কেউ আমার সঙ্গে কথাও বলে না। অফিস থেকে এসে ইজিচেয়ারে বসে থাকি। যে যার মতো ঘুরে বেড়ায়। আমার সঙ্গে দুটা কথা বলার সময় কারোর নাই।

ইয়াকুবের গলা ধরে এসেছে। তাঁর চোখে সত্যি সত্যি পানি। তিনি শার্টের হাতায় চোখ মুছলেন। মৃন্ময়ী বলল, চাচা আমি কি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?

ইয়াকুব বললেন, অবশ্যই পার। তোমাকে আমি মেয়ের মতো বিবেচনা করেই মা ডাকি। মেয়ে বাবাকে অনুরোধ করবে না, করবে আদেশ। বল মা তোমার আদেশ কী?

মৃন্ময়ী বলল, ছন্দার এই বিয়েটা ভেঙ্গে দিন। তার পছন্দ হয় এমন একটা ছেলের সঙ্গে আমি বিয়ের ব্যবস্থা করব। পরীক্ষার মাঝখানে বিয়ের যন্ত্রণায় ও পরীক্ষায় খারাপ করবে। ছন্দার ভালো রেজাল্ট করা দরকার।

ইয়াকুব বললেন, মা তুমি যখন দায়িত্ব নিয়েছ তখন আমার কোনো কথা নাই।

বিন্তি রাতের শেষ চা নিয়ে এসেছে। মৃন্ময়ী বলল, চা খাব না।

বিন্তি বলল, আপনার চুলে তেল দিয়ে দিব আপা?

মৃন্ময়ী বলল, না। আমি চুলে তেল দেই না।

একদিন দিয়া দেখেন খুব আরাম পাইবেন।

খুব আরামের কি দরকার আছে?

অবশ্যই আছে। আরামের জন্যই তো দুনিয়া।

মৃন্ময়ী বলল, যাও তেল নিয়ে আসো। দেখি কী রকম আরাম!

ঘরের বাতি কমিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা টেবিল ল্যাম্প ছাড়া সব বাতি নেভানো। মৃন্ময়ী বিছানায় শুয়ে আছে। বিন্তি চুলে তেল দিয়ে চুল টেনে দিচ্ছে।

বিন্তি বলল, আপা একটা গফ শুনবেন?

মৃন্ময়ী বলল, গফ না গল্প। যদি ভাষা শুদ্ধ করে বলতে পার তা হলে শুনব।

বিন্তি বলল, আমরার গ্রামে আপনের মতো সুন্দরী একটা মেয়ে ছিল। বারো- তেরো বছর বয়স হইতেই এই মেয়ের জন্য ভালো ভালো সম্বন্ধ আসা শুরু হইল। এর মধ্যে একজনের সঙ্গে বিবাহ ঠিক হয়ে গেল। তখন মেয়েটারে ধরল জিনে।

জিনে ধরল মানে কী?

সুন্দরী মেয়েদের জীনে ধরে। তারার শরীরে জীনের ভর হয়।

আমিও তো সুন্দর। আমার সঙ্গে জীন আছে?

বিন্তি বলল, অবশ্যই আছে। আপনে যে উল্টা-পাল্টা কাজ-কাম করেন জিনের কারণে করেন।

উল্টা-পাল্টা কাজ কী করলাম?

আপনের নাক ফুল দিয়া কী করলেন আপনার মনে নাই?

মৃন্ময়ীর টেলিফোন বেজে উঠেছে। সে ঘড়ি দেখল। সাড়ে এগারোটা বাজে। মৃন্ময়ী টেলিফোন কানে নিয়ে দু'বার হ্যালো বলতেই ও পাশ থেকে লাইন কেটে দিল।

মীনা বলল, ভাইয়া তুমি কি দুপুরে খাবে?

জহির বলল, না।

রাতে কখন ফিরবে? দেরি হবে?

দশটার মধ্যে ফিরব।

মীনা বলল, ভাইয়া একটা ফ্রিজ কিনতে পার না। ফ্রিজ থাকলে খাবার নষ্ট হতো না। গরমের সময় ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি খেতে কত ভালো লাগে।

জহির কিছু বলল না। মীনার অতি স্বাভাবিক আচরণ মাঝে-মাঝে তার কাছে বিস্ময়কর লাগে। সবুজের প্রসঙ্গ একবারও সে তুলে না। যেন সবুজ নামের কেউ তার জীবনে আসে নি।

ভাইয়া টুনটুনি আজ কী করেছে শোন! আঙুল কেটে ফেলেছে। টুনটুনি মামাকে কাটা আঙুল দেখাও।

টুনটুনি ভয়ে-ভয়ে একটা আঙুল উঁচু করে দেখাল। মীনা বলল, এখন মামার কাছে নিয়ে যাও মামা আঙুলে উম্মা দিয়ে দিবে।

জহির বলল, উম্মা কী?

মীনা বলল, উম্মা হলো চুমু। টুনটুনি নিজে-নিজে অনেক অদ্ভুত শব্দ বানিয়েছে। যেমন তুলতা। তুলতা শব্দটার মানে কী ভাইয়া আন্দাজ কর তো।

আন্দাজ করতে পারছি না।

মীনা বলল, তুলতা হলো বিড়াল। দুটা শব্দের মধ্যে কোনো মিল আছে বল? কোথায় তুলতা আর কোথায় বিড়াল। টুনটুনি যাও মামার কাছে। মামা তোমাকে উম্মা দিবে। মামাকে ভয় পাও কেন? যাও। যাও।

জহির বলল, জোর করে পাঠাতে হবে না। ভয় আস্তে আস্তে ভাঙাই ভালো। তোর বাজার-টাজার কিছু লাগবে?

মীনা বলল, বাজার আছে। ভাইয়া একটা টেলিভিন কিনে দাও না। সারদিন ঘরে থাকি। টেলিভিশন থাকলে সময় কাটত। কতদিন নাটক দেখি না।

জহির বের হয়ে গেল। প্রথমে গেল হাসপাতাল, ফজলুর সঙ্গে কিছু সময়

কাটালো। সেখান থেকে সাভারে আলিমুর রহমান সাহেবের খামারবাড়ি। পোট্রেটের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। দু-একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।

ফজলুর অবস্থা কয়েক দিনে আরো খারাপ হয়েছে। সে এখন একনাগারে বেশিক্ষণ তাকিয়েও থাকতে পারে না। আপনাতেই চোখ বন্ধ হয়ে আসে। তবে গলার স্বর এখনও সতেজ। সে পাশ ফিরে শুয়েছে। জহিরের দিকে তাকিয়ে আগ্রহের সঙ্গে গল্প করছে।

এক লোক লটারিতে জিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। ফার্স্ট প্রাইজ হচ্ছে সারা পৃথিবী ভ্রমণের প্লেনের টিকিট। ফ্রী হোটেল। ফ্রী খাওয়া-দাওয়া। এত বড় লটারি জিতেও লোকটার মুখে হাসি নেই। একজন জিজ্ঞেস করল, কী হলো ভাই খুশি হন নাই? লোকটি মাথা চুলকে বলল, খুশি হয়েছি তবে অন্য কোথাও যেতে পারলে ভালো হতো।

প্রশ্নকর্তা বললেন, অন্য কোথাও মানে কী?

সেই লোক বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, মানে গ্রামের কোনো বাঁশবন। মেঠোপথ। এইসব আর কি...।

জহির বলল, এই গল্পের মানে কী?

ফজলু বলল, মানে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার গ্রামের বাঁশবন, মেঠোপথ এই সব দেখতে ইচ্ছা করছে। দশ বছরের বেশি হয়েছে গ্রাম দেখি না।

জহির বলল, শরীর ঠিক হোক গ্রাম দেখিয়ে আনব।

শরীর ঠিক হবে না। সস্তা দেশী মদ খেয়ে লিভার তো আগেই নষ্ট ছিল, এখন ধরেছে ভাইরাস বাবাজি। শক্ত জিনিস।

জহির বলল, তোর শরীর একটু সারলেই তোকে আমি আমার কাছে এনে রাখব। আমার বোন আছে সে যত্ন করবে।

ফজলু বলল, এই দফায় টিকে গেলে বাঁশবনের ছবি আঁকব। বাঁশবনের ভিতর দিয়ে রোদে এসে পড়েছে। শুধুই আলোছায়ার খেলা। লেমন ইয়োলো আর কোবাল্ট ব্লু। তোর পোট্রেট আঁকা কেমন চলছে?

ভালো।

কয়েকদিন থেকে কেন জানি ছবি আঁকতে ইচ্ছা করছে। ওয়াটার কালার। হালকা ওয়াসে দুই-একটা গাঢ় রঙের টান।

জহির বলল, কাগজ, রঙ দিয়ে যাব?

ফজলু বলল, পাগল হয়েছিস! জেনারেল ওয়ার্ডের এক মরণাপন্ন রোগী

BDeBooks.com

জীবনের শেষ ছবি আঁকছে— এই সব সিনেমায় সম্ভব, বাস্তবে সম্ভব না। তুই এখন চলে যা। কতক্ষণ আর রোগীর পাশে বসে থাকবি।

জহির বলল, বইটই কিছু দিয়ে যাব? সময় কাটানোর জন্য?

একটা খাবনামা দিয়ে যাবি। বিকট স্বপ্ন দেখি। খাবনামায় স্বপ্নের অর্থ পড়লে মজা লাগবে।

কী রকম স্বপ্ন?

একটা স্বপ্নে দেখলাম আমার হাতে আঙুলের সংখ্যা বেড়ে গেছে। অনেকগুলি করে আঙুল কিলবিল করছে। মাথা-টাথা নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ এ-রকম স্বপ্ন দেখে। নানান হাইপোথিসিস নিয়ে চিন্তা করে করে আমার মাথা গেছে।

জহির উঠে পড়ল। বাস ধরে সাভার যেতে হবে। আলিমুর রহমান সাহেব যদিও বলে দিয়েছিলেন, ম্যানেজারকে বললেই ম্যানেজার গাড়ি পাঠাবে। কী দরকার? মানুষের কাছ থেকে উপকার নিতেও হয় না, উপকার করতেও হয় না।

সেই আগের দৃশ্য।

আলিমুর রহমান পা তুলে চেয়ারে বসে আছেন। জহির ব্রাশ ঘষছে। জহিরের ঠোঁটে সিগারেট।

আলিমুর রহমান বললেন, ছবি কী আজ শেষ হবে?

জহির বলল, না।

কবে শেষ হবে?

জানি না।

ঠিক আছে তাড়াহুড়া নাই। আঁকতে থাক। মীনা ভালো আছে? তোমার বোন মীনা।

জি স্যার! ভালো আছে।

তোমার বোনের যে মেয়ে সে ভালো আছে?

জি ভালো আছে।

তার নাম কী?

তার নাম টুনটুনি।

জহির একটা কাজ কর। একদিন মীনা আর টুনটুনিকে এখানে নিয়ে এসো।

এটা ভালো হবে না স্যার।

ভালো হবে না কেন?

আমার বোন আহ্লাদী ধরনের মেয়ে। আপনার সঙ্গে নানান আহ্লাদী করবে। আপনি রেগে যাবেন।

রেগে যাব কেন?

ওর আহ্লাদী সহ্য করার মতো না।

আলিমুর রহমান আগ্রহ নিয়ে বললেন, একটা উদাহরণ দাও তো।

উদাহরণ মনে আসছে না স্যার! তবে সে যে কোনো মানুষকে আহ্লাদী করে অতি দ্রুত রাগিয়ে দিতে পারে।

আলিমুর রহমান গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, কালাম! কালাম!

ছবি আঁকার সময় কালাম বড় সাহেবের দৃষ্টির বাইরে থাকে, তবে সারাক্ষণ কানখাড়া করে রাখে। যেন ডাক শোনামাত্র ছুটে আসতে পারে। কালাম এসে সামনে দাঁড়াল। আলিমুর রহমান বললেন, তুমি এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে ঢাকায় যাও। জহিরের বোন আর বোনের মেয়েকে নিয়ে আসবে। জহিরের কাছ থেকে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে যাও।

জহির ছবি আঁকা বন্ধ করে তাকিয়ে আছে। আলিমুর রহমান হুকুমের গলায় বললেন, জহির তোমার বাসার ঠিকানা ম্যানেজারকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও। অনেক দিন কোনো আহ্লাদী মেয়ে দেখি না। একটা দেখতে ইচ্ছা করছে।

আলিমুর রহমান সিগারেট ধরালেন। লম্বা লম্বা টান দিয়ে মুখ গোল করে ধোয়া ছাড়ছেন। তাঁকে আনন্দিত মনে হচ্ছে।

জহির!

জি স্যার!

আমার মহাজ্ঞানী পুত্র ছবি আঁকার জন্যে তোমাকে কত টাকা দেবে বলে ঠিক করেছে?

উনি কিছু বলেন নি।

তুমি কিছুই পাবে না। সে তোমাকে এক টাকার একটা ময়লা ছেড়া নোটও দিবে না। কারণ তার ব্যাংকে টাকা নেই। আমি খবর নিয়েছি। তার মাথা এখন ফোর্টি নাইন। ফোর্টি নাইন শব্দের অর্থ জান?

জি জানি।

আমার পুত্রের মাথা এখন ফোর্টি নাইন। সাত গুণন সাত। হা হা হা। আচ্ছা জহির শোন তোমার আহ্লাদী বোন কী খেতে পছন্দ করে? তার পছন্দের সব খাবার বাবুর্চিকে রান্না করতে বলব।

মীনা চলে এসেছে এবং মেয়ে নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘোরাঘুরি করছে। ম্যানেজার তাকে আলিমুর রহমানের কাছে নিয়ে গেল। মাঝখানে গলা নামিয়ে

বলল, স্যারের সঙ্গে কোনো বেয়াদবী করবেন না।

মীনা বিরক্ত হয়ে বলল, বেয়াদবী কেন করব! আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয় আমি বেয়াদব মেয়ে?

এম্নি বললাম। আমাদের স্যার খুব রাগী মানুষ তো।

মীনা বলল, আমরাও খুব রাগী। আমাদের টাকাপয়সা আপনাদের চেয়ে কম এটা মানি। আমাদের রাগ কম এটা মানি না।

আলিমুর রহমান মাছ মারতে বসেছেন। মীনা তাঁকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। টুনটুনিকে দিয়েও করাল। টুনটুনিকে সে সালাম করা শিখিয়েছে।

আলিমুর রহমান বললেন, মেয়ে তো খুব সুন্দর!

মীনা বলল, ওর বাবার মতো হয়েছে। তবে ওর বাবার রঙ আরো ভালো।

তাই না কি?

জি। সে আপনার চেয়েও ফর্সা। ঢাকায় থাকলে আপনাকে এনে দেখাতাম। সে আছে বিদেশে। মিডিল ইস্টে। বড় চাকরি করে।

ও আচ্ছা!

কোয়ার্টার পেয়েছে। চার রুমের বিরাট বাড়ি। সার্ভেন্টের জন্যে আলাদা ঘর। ওদের পেশাব-পায়খানার জন্য আলাদা বাথরুম। চিঠি লিখেছে আমাদের চলে যাবার জন্যে।

যাচ্ছ না কেন?

ভাইয়াকে একা ফেলে কীভাবে যাব বলেন? ভাইয়াকে কে দেখবে? আমরা দুই ভাই-বোন ছাড়া আর কেউ নাই। মা আমার জন্মের সময় মারা গেছেন। বাবা মারা গেছেন আমার যখন আট বছর বয়স। মা-বাবা না থাকার জন্যে আমাদের দুই ভাই-বোনের মধ্যে মিল খুব বেশি। তাই ঠিক করেছি ভাইয়াকে বিয়ে দিয়ে তারপর যাব। তাকে একা ফেলে যাব না। এটা ভালো না?

হ্যাঁ ভালো।

ভাইবোনের মধ্যে আমাদের মতো মিল আপনি কোথাও দেখবেন না। আপনার সঙ্গে এই নিয়ে লক্ষ টাকা বাজি রাখতে পারি। এই যে দেখুন, আপনার এখানে ভাইয়া ছবি আঁকতে এসেছে, এটাই তো তার কাজ। এর মধ্যে জরুরি চিঠি দিয়ে আমাকে আনিয়েছে। টুনটুনিও ভাইয়ার চোখের মণি। বেশিক্ষণ টুনটুনিকে না দেখলে ভাইয়া থাকতে পারে না। টুনটুনিকে নিয়ে বিদেশে চলে গেলে ভাইয়ার অবস্থা কী হবে চিন্তা করে আমার ঘুম হয় না।

আলিমুর রহমান বললেন, তুমি তো ভালো সমস্যাতেই আছ।

জি! বিরাট সমস্যায় আছি। আপনার এখানে ক্যামেরা আছে?

কেন বল তো?

নতুন জায়গায় এসেছি, কিছু ছবি তুলতাম। টিয়াকে পাঠাতাম। টুনটুনির বাবার নাম সবুজ। ও আমাকে ডাকে ময়না, আমি তাকে ডাকি টিয়া।

আলিমুর রহমান বললেন, তোমরা তা হলে পাখি বংশ? টুনটুনি, ময়না, টিয়া।

মীনা আনন্দিত গলায় বলল, জি! আমরা পাখি বংশ। টুনটুনির একটা ভাই যখন হবে তার নাম রাখব তিতির। তিতিরপাখির নাম আপনি শুনেছেন না?

শুনেছি।

তিতির নাম সুন্দর না?

হ্যাঁ সুন্দর।

আলিমুর রহমান ম্যানেজারকে পাঠালেন ক্যামেরা আনতে।

মীনা বলল, আপনার মাছ মারার শখ, তাই না?

হ্যাঁ।

টুনটুনির বাবারও মাছ মারার খুব শখ। ওদের নিজস্ব বিরাট পুকুর আছে। পুকুর ভর্তি মাছ। আপনি যেমন মাছ মারার জন্যে আলাদা ঘাটলা বানিয়েছেন ওদেরও সে-রকম আছে। ছুটির দিনে সকালে সে মাছ মারতে বসে। আমাকে সব কাজ ফেলে পাশে বসে থাকতে হয়। কাজ-কর্মের অবশ্য কোনো অসুবিধা হয় না। ওদের অনেকগুলি কাজের লোক।

আলিমুর রহমান মুগ্ধ হয়ে মেয়েটার কথা শুনছেন। কী গুছিয়েই না এই মেয়ে অনর্গল মিথ্যা বলে যাচ্ছে!

আলিমুর রহমান বললেন, তোমার স্বামী মাছ মারে তুমি পাশে বসে থেকে কী কর?

কী আর করব! কখনও কুরশি কাটা দিয়ে সেলাই করি আবার কখনও গান-টান গাই।

তুমি গান জান না-কি?

রেডিও-টিভি থেকে শুনে শুনে শিখেছি। টুনটুনির বাবা অবশ্য অনেকবার বলেছে গানের টিচার রেখে দেই। গান শেখ। আমি বলেছি, না।

না বললে কেন?

আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই খুব ইসলামিক মাইন্ডেট। গান-বাজনা পছন্দ করেন না। আপনি কি আমার একটা গান শুনবেন?

অবশ্যই শুনব।

সিনেমার গান। সিনেমা থেকে শিখেছি।

মীনা গান ধরল— একটা ছিল সোনার কন্যা।

ম্যানেজার কালাম ক্যামেরা নিয়ে এসে অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল। বড় সাহেবের কোলে টুনটুনি নামের মেয়েটা বসে আছে। মেয়েটার মা সামনে বসে গান গাইছে।

আলিমুর রহমান তাঁর লইয়ারকে নিয়ে বসেছেন। তিনি উইলে আরো কিছু পরিবর্তন করবেন। মীনা এবং টুনটুনির জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করবেন যেন বাকি জীবন তারা নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারে।

উকিল বললেন, দানপত্র করাই ভালো। দানপত্রে লিখতে হবে যে মেয়েটার সেবায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে দান করিলাম।

আলিমুর রহমান বললেন, সেবায় তুষ্ট হই নাই। তার মিথ্যা কথা শুনে তুষ্ট হয়েছি। যদি লেখা হয় "তাহার মিথ্যা কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া অমুক অমুক জিনিস দান করিয়াছি।" তাতে অসুবিধা আছে?

উকিল তাকিয়ে রইল।

আলিমুর রহমান বললেন, আমার তুষ্ট হওয়া দিয়ে কথা। তুষ্ট কীভাবে হয়েছি সেটা বিষয় না। তুমি কাগজপত্র তৈরি কর।

আপনি আপনার ছেলেকে সত্যি কিছু দেবেন না?

না।

কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

আলিমুর রহমান বললেন, তোমাকে টাকা দিয়ে আমি এনেছি আমার কাজের সমালোচনার জন্য না। আমার কাজ করে দেবার জন্য।

ইয়াকুব আলি সকাল আটটা থেকে মৃন্ময়ীদের বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে আছেন। তাঁর চেহারায় দিশাহারা ভাব। বাড়িতে ঢুকে তিনি বেশ হকচকিয়ে গেছেন। মৃন্ময়ী মেয়েটা বড়লোকের মেয়ে এটা তিনি জানেন কিন্তু সে যে এমন একটা বাড়িতে থাকে তিনি চিন্তাও করেন নি।

বিশাল ড্রয়িং রুমের এক কোনায় তিনি হতাশ হয়ে বসে আছেন। ম্যানেজার জাতীয় একটা ছেলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ছেলেটা বলেছে, মৃন্ময়ী আপা তার ঘরেই আছেন। হাঁটাহাটি করছেন, গান শুনছেন। তবে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, কাজেই এখন দরজায় টোকা দেয়া যাবে না।

ইয়াকুব বললেন, দরজা বন্ধ থাকলেই না লোকজন বাইরে থেকে টোকা দেবে। দরজা খোলা থাকলে দিবে কেন?

এই বাড়ির এ-রকমই নিয়ম। আপনি বসুন আপা দরজা খুললেই তাকে খবর দেয়া হবে। আপা কি আপনাকে চেনেন?

আমার মেয়ে তার সঙ্গে পড়ে। আমার নাম ইয়াকুব আলি।

ইয়াকুব একবার ভাবলেন বলবেন আমার মেয়ের নাম ছন্দা। শেষপর্যন্ত বললেন না। এমনও হতে পারে ছন্দা পালিয়ে এ-বাড়িতেই বসে আছে। এখন হয়ত গল্প করছে মৃন্ময়ীর সঙ্গে।

গতকাল সকালে তিনি ছন্দাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। কঠিন গলায় বলেছেন, বাকি জীবন আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।

ছন্দা কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, বাবা আমি যাব কোথায়?

তিনি বলেছেন, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবি। আমার এখানে না। আমি চোর-মেয়ে ঘরে রাখব না।

ঘটনা ঘটেছে সকাল নয়টায়। বারো ঘণ্টা পর রাত নয়টার দিকে তিনি খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছেন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবখানে। মৃন্ময়ীকে টেলিফোন করেছেন কিছুক্ষণ পর পর। যতবারই টেলিফোন করেন ততবারই শোনা যায়— এখন সংযোগ দেয়া সম্ভব না। আবার ডায়াল করুন।

মৃন্ময়ীর বাসার ঠিকানা বের করতেও তাঁর খুব ঝামেলা হয়েছে। কেউ ঠিকানা বলতে পারে না।

আপনি কি চা খাবেন? চা দিতে বলি?

ম্যানেজার ছেলেটা আবার এসেছে। ইয়াকুব আলি বললেন, দরজা কি খুলেছে?

জি-না এখনও না। আপনাকে চা দিতে বলি?

না। এক গ্লাস পানি দিতে পারেন।

টেবিলের নিচে খবরের কাগজ আছে। ইচ্ছা করলে খবরের কাগজ পড়তে পারেন।

আমার কিছু লাগবে না। একটু তাড়াতাড়ি যদি খবরটা দেয়া যায়। বিশেষ ঝামেলায় আছি।

দরজা খুললেই খবর দেব।

ইয়াকুব বুঝতে পারছেন না ঝামেলার ব্যাপারটা মৃন্ময়ীকে খোলাখুলি বলবেন কি-না। বলা অবশ্যই উচিত কিন্তু বলবেন কীভাবে? সবকিছু কি বলা যায়?

ঘটনাটা এ রকম— সকালে নাশতা খেয়ে তিনি চায়ের কাপ নিয়ে ইজিচেয়ারে বসেছেন, হুড়মুড় করে তিনটা মেয়ে ঢুকে পড়ল। তিনি যে বসে আছেন সে-দিকে ফিরেও তাকালো না। ঢুকে গেল ছন্দার ঘরে। বিছানা বালিশ উল্টাচ্ছে, ড্রয়ার খুলছে, আলমিরা খুলছে। তিনি বললেন, এইসব কী? মেয়ে তিনটার একটা বলল, ছন্দা তার গয়না চুরি করেছে। দুই ভরি ওজনের একটা গলার চেইন।

ইয়াকুব বললেন, তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে? আমার মেয়ে করবে চুরি? আমার মেয়ে?

আর তখনই অন্য একটা মেয়ে বলল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে। মেয়েটার হাতে চেইন। তারা যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল, সে-রকম ঝড়ের মতো চলে গেল। তিনি দেখলেন, ছন্দা ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। তিনি বললেন, ছন্দা তুই কি চেইনটা চুরি করে এনেছিলি?

ছন্দা জবাব দিল না।

মৃন্ময়ী এসেছে। ইয়াকুব আলিকে দেখে সে মোটেই চমকালো না। স্বাভাবিক গলায় বলল, চাচা স্লামালিকুম। আপনি এসেছেন? কেমন আছেন চাচা।

ইয়াকুব আলি বললেন, মাগো! আমি ভালো নাই। আমি খুব খারাপ আছি।

ছন্দা কি তোমার এখানে?

না তো।

তোমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে?

জি না। চেষ্টা করলেও টেলিফোনে আমাকে ধরতে পারত না। আমি সব সময় টেলিফোন বন্ধ করে রাখি। শুধু আমার যখন কথা বলার দরকার হয় তখন অন করি। চাচা ব্যাপারটা কী বলুন তো?

ইয়াকুব মাথা নিচু করে ঘটনা বর্ণনা করলেন। কয়েকবার তাঁর গলা বন্ধ হয়ে গেল। মৃন্ময়ী বসেছে তাঁর পাশে। সে শান্ত ভঙ্গিতে পুরো ব্যাপারটা শুনলো। ইয়াকুব বললেন, মা দেখ তো এই জিনিসটা কি তোমার?

তিনি শার্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়া হীরের নাকফুল বের করলেন। বিব্রত গলায় বললেন, ছন্দা বলেছে তোমার বাড়ি থেকে তোমাকে না বলে নিয়েছে।

মৃন্ময়ী বলল, চাচা এই জিনিস আমার না। আমি নাকফুল ব্যবহার করি না।

ইয়াকুব বলেলেন, তা হলে মনে হয় অন্য কারো কাছে থেকে চুরি করেছে। মার খেয়ে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে বোধ হয়। তোমার নাম মনে এসেছে বলেছে।

মেরেছেন?

হ্যাঁ। রাগ সামলাতে পারলাম না। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, তার স্যুটকেসে সিগারেট লাইটার পর্যন্ত আছে। তিনটা লাইটার! যা পেয়েছে চুরি করেছে।

চাচা আপনি কি নাশতা করেছেন?

মাগো নাশতা করার মতো মনের অবস্থা নাই। মেয়েটা রাতে কোথায় ছিল, কার কাছে ছিল, কিছুই তো জানি না।

ইয়াকুব কেঁদে ফেললেন। মৃন্ময়ী বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। নাশতা করবেন। আমি চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করি সে কোথায় থাকতে পারে।

মা আমি নাশতা খাব না। আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না। তুমি চিন্তা করে বল, সে কোথায় যেতে পারে। মেয়েটার জন্য আমি শাহজালাল সাহেবের দরগায় সিন্নি মানত করেছি।

মৃন্ময়ী বলল, আপনি অবশ্যই আমার সঙ্গে নাশতা খাবেন। রাতে কি কিছু খেয়েছেন? না কি রাতেও কিছু খান নি?

ইয়াকুব জবাব দিলেন না।

মৃন্ময়ী হাত ধরে তাকে টেনে তুলল। আবারও ইয়াকুবের চোখে পানি এসে গেল। তার নিজের মেয়ে কোনোদিন হাত ধরে তাকে টেনে তুলে খেতে নিয়ে যায় নি, আর এ অন্যের মেয়ে।

নাশতার টেবিলে বসতে বসতে মৃন্ময়ী বলল, চাচা আমি প্রসেস অব এলিমিনেশনের মাধ্যমে ছন্দা কোথায় থাকতে পারে বের করে ফেলেছি।

ইয়াকুব তাকিয়ে আছেন। মৃন্ময়ী বলল, আমি চিন্তা করছি আমি ছন্দা হলে কী করতাম? আমি আমার কোনো আত্মীয়ের বাড়ি যেতাম না। সেটা হতো আমার জন্যে লজ্জার ব্যাপার।

ইয়াকুব বললেন, ঠিক বলেছ। আমি সবার বাসায় খোঁজ নিয়েছি সে নাই।

মৃন্ময়ী বলল, আমি কোনো বান্ধবীর বাড়িতে বা ক্লাসফ্রেন্ডের বাড়িতে যেতাম না। সেটা হতো আরও লজ্জার। এই জাতীয় ঘটনা অতি দ্রুত সবাই জেনে যায়।

ঠিক বলেছ।

আমি দূরে কোথাও যেতাম না। দূরে যেতে সাহস লাগে। ছন্দার এত সাহস নেই। সঙ্গে টাকাও নেই।

ইয়াকুব বললেন, সে এক বস্ত্রে বের হয়েছে। সঙ্গে টাকাপয়সা দূরের কথা রিকশা ভাড়ার টাকাও নেই।

মৃন্ময়ী বলল, ছন্দার জন্যে একটা জায়গাই শুধু আছে— যে ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়েছে সে আছে সেখানে। আপনি ঐ বাড়িতে গেলেই তাকে পাবেন।

ইয়াকুব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। মৃন্ময়ীর কথা তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। বাচ্চা একটা মেয়ের এত বুদ্ধি দেখে তিনি চমৎকৃত।

মৃন্ময়ী বলল, চাচা আপনি শান্তিমতো নাশতা খান, চা খান। আমি আপনাকে একটা গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি। গাড়ি নিয়ে যান।

গাড়ি দিতে হবে না মা।

আমি যা বলছি শুনুন তো। আপনিই তো বলেছিলেন মেয়ে বাবাকে অনুরোধ করবে না, বাবাকে করবে আদেশ। আমি আপনার মেয়ের মতো না?

অবশ্যই। অবশ্যই।

আমি পাউরুটিতে মাখন লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনি খাবেন আমি দেখব। পাউরুটিতে মাখন লাগাতে আমার খুব ভালো লাগে।

ইয়াকুব ঠিক করে ফেললেন মৃন্ময়ী নামের মেয়েটার বিয়েতে যেভাবেই

হোক সোনার কিছু দেবেন। গলার হার কিংবা হাতের চুড়ি। এতে যদি তাঁর গ্রামের বসতবাড়ি বিক্রি করতে হয় তাতেও তিনি রাজি আছেন।

মৃন্ময়ী যা বলেছিল তা-ই। ছন্দা সেই বাড়িতেই আছে। গতকাল রাত এগারোটায় কাজী ডেকে পাঁচ লক্ষ এক টাকা দেন মোহরানায় বিয়েও হয়ে গেছে। বরের ছোট মামা বললেন, আপনাকে খবর দিতাম কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন! মেয়েকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছেন। ছিঃ ছিঃ! একবার চিন্তাও করলেন না। এই বয়সের একটা মেয়ে কোথায় যাবে? যাই হোক আপনি এসেছেন আমরা খুশি। মেয়ে জামাইকে দোয়া করে যান।

জামাই এসে সালাম করল। ছন্দা বাবার সামনে বের হলো না। সে কিছুতেই আসবে না।

বরের মামা বললেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে। এত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নাই। ধীরে ধীরে মিলমিশ হবে। বাবা-মেয়ের রাগারাগি ললিপপ আইসক্রিম। সামান্য গরমেই গলে পানি।

ইয়াকুবকে ঐ বাড়িতে দই-মিষ্টি খেতে হলো। বরের মামা গলা নামিয়ে বললেন, বেয়াই সাহেব! বৌমাকে আমাদের সবার পছন্দ হয়েছে। অসাধারণ মেয়ে। প্রথম রাতেই সে তার স্বামীকে বলেছে, তোমার মেয়ে অন্যবাড়িতে কেন থাকবে? এখন আমি তার মা। সে তার মার বাড়িতে থাকবে।

রাতেই মেয়েকে নানীর বাড়ি থেকে আনা হয়েছে। সেই মেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে হয়েছে মায়ের ভক্ত। সারক্ষণ মায়ের পিছনে পিছনে ঘুরছে।

ইয়াকুব বললেন, ভালো তো। বেশ ভালো।

চুপেচাপে বিয়ে হওয়াতে আপনার জন্যও তো ভালো হয়েছে। খরচের হাত থেকে বেঁচে গেলেন। হা হা হা। ঠাট্টা করলাম। বেয়াই সাহেব কিছু মনে করবেন না।

ইয়াকুব বললেন, কিছু মনে করি নি। ছন্দার এক বান্ধবী তাকে একটা চিঠি দিয়েছে। চিঠিটা কি ছন্দার হাতে দেয়া যাবে?

অবশ্যই দেয়া যাবে। আমার হাতে দিন। আমি দিয়ে আসছি।

মৃন্ময়ী চিঠিতে লিখেছে—

ছন্দা,

আমার হিসাব যদি ঠিক হয়, তা হলে তুই সুখে আছিস। তুই অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে। অতি বুদ্ধিমতীরা সুখ বের করে নিতে

জানে। বোকা মেয়েগুলিই বেছে বেছে দুঃখ কুড়ায়। আমি তোকে খুব পছন্দ করি আবার তোর বাবাকেও খুব পছন্দ করি। অথচ দুইজন দুই মেরুর।

ভালো থাকিস।

ইতি
মৃন্ময়ী

পুনশ্চ # ১ : তোর একটা পেট্রেটা করাব বলেছিলাম, মনে আছে? আর্টিস্ট ভদ্রলোক আগামীকাল থেকে ফ্রী। দাদার ছবি তিনি একে শেষ করেছেন। আজ হ্যান্ডওভার করবেন। আমি ছবি হ্যান্ডওভারের দৃশ্য দেখতে যাচ্ছি। দাদাজানের ছবি যদি পছন্দ হয় তবেই তোর ছবি আঁকানো হবে। তৈরি হয়ে থাক।

পুনশ্চ # ২ : তোর যে একটা মানসিক রোগ আছে, শুনেছি বিয়ের পর এই রোগ সেরে যায়। স্বামীর ভালোবাসা এই রোগের একমাত্র ওষুধ। মনে রাখিস।

জহির মৃন্ময়ীর হাতে ছবি দিল। মৃন্ময়ী অনেক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনাকে যেমন আঁকতে বলা হয়েছিল আপনি সে রকম আঁকতে পারেন নি। আপনাকে বলা হয়েছিল কঠিন চোখে দাদাজান তাকিয়ে আছেন— এমন ছবি আঁকবেন। আপনি দুনিয়ার মমতা দাদাজানের চোখে দিয়ে দিয়েছেন। এই ছবি আমি বাবাকে দিতে দেব না। এটা আমি রেখে দেব। দরকার হলে আপনি আরেকটা আঁকবেন।

আলিমুর রহমান ছবি হাতে নিয়ে বললেন, জহির চোখের কোনায় কি পানি?

জহির বলল, জি স্যার! আপনি আপনার মায়ের কথা বলছিলেন। তখন আপনার চোখ ভিজে উঠেছিল। ঐটা আমার মাথার ভিতর ঢুকে গিয়েছিল।

মৃন্ময়ী বলল, আর্টিস্ট সাহেব। ছবির দিকে তাকালেই মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে আমার তরফ থেকে সামান্য উপহার দিতে চাই। বলুন কোন উপহার পেলে আপনি খুশি হবেন? তাড়াতাড়ি বলতে হবে। এক থেকে তিন গুনার মধ্যে বলবেন। এক... দুই...

জহির বলল, আমার এক বন্ধু আছে। তার নাম ফজলু। ওয়াটার কালারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। আমি তার কাছে কিছু না। আমার বন্ধুটা মরতে বসেছে। ডাক্তররা বলেছেন বাইরে নিয়ে শেষ চেষ্টা করতে। আমি যাতে সেই শেষ চেষ্টাটা করতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।

মৃন্ময়ী বলল, দাদাজান ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনি এই নিয়ে আর চিন্তাই করবেন না।

জহির বলল, থ্যাংক য়্যু।

আলিমুর রহমান বললেন, জহির তোমার একটা সস্তা সিগারেট দাও তো খাই। শোন জহির! আমি মুখ ভেংচি দিয়ে আছি, এ-রকম একটা ছবি একে দাও। আমি আমার গাধাপুত্রকে উপহার দেব।

জহির হাসলো।

আলিমুর রহমান বললেন, হাসি না, এখনই আঁকা শুরু কর। ভেংচি-মুখ

আঁকবে। তোমার রঙের বাক্স নিয়ে আস।

মৃন্ময়ী বলল, আজকের দিনটা বাদ থাকুক। কাল থেকে আঁকা হবে।

আলিমুর রহমান বললেন, আজই। আজ আমার ভেংচি দিতে ইচ্ছা করছে। কাল হয়ত করবে না। মৃন্ময়ী দেখ তো, কোন ভেংচিটা ভয়ঙ্কর?

আলিমুর রহমান ভেংচির কয়েকটা নমুনা দেখালেন। মৃন্ময়ী খিলখিল করে হাসছে। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল।

মৃন্ময়ী বলল, আর্টিস্ট সাহেব এই দেখুন আমার চোখে পানি। ভালো করে দেখে রাখুন। যদি কখনও আমার ছবি আঁকেন চোখের কোণে পানি দিতে ভুলবেন না।

জহিরকে ব্রাশ, রঙ নিয়ে বসতে হলো। তার কাছে মানুষটার কাণ্ডকারখানা অদ্ভুত লাগছে। তিনি সত্যি সত্যি মুখ ভেংচি দিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। মৃন্ময়ী একা একা বাগানে হাঁটছে।

জহির বলল, স্যার আপনাকে সিটিং দিতে হবে না, আপনার চেহারা আমার মাথায় আছে। আপনি আপনার নাতনীর সঙ্গে গল্প করুন। বেচারী একা একা হাঁটছে।

আলিমুর রহমান বললেন, আমার নাতনী যে তোমাকে খুব পছন্দ করে এটা টের পেয়েছ?

আমার আঁকা ছবি উনার পছন্দ হয়েছে এইটুকু বুঝতে পেরেছি।

আমার নাতনীকে তোমার কেমন লাগে? সে কী টাইপের মেয়ে?

জহির বলল, আপনার মতো। আপনার সঙ্গে সাংঘাতিক মিল।

আলিমুর রহমান বললেন, আমার সঙ্গে কী মিল দেখলে?

জহির বলল, আপনার মতো পাগলাটে স্বভাব।

তোমার স্বভাব কেমন?

আমার মধ্যে পাগলামী নেই, আমার বন্ধু ফজলুর মধ্যে আছে। আর্ট কলেজে পড়বার সময় সে একবার ঠিক করল কলেজের বাইরের সময়টায় সে ভিক্ষা করবে। পুরোপুরি ভিক্ষুক।

আলিমুর রহমান আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, ভিক্ষা করেছে?

জহির বলল, তিন মাসের মতো করেছে। একদিন প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। স্যার গাড়ি করে ফিরছেন। সিগন্যালে গাড়ি থেমেছে। ফজলু গেছে ভিক্ষা চাইতে।

আলিমুর রহমান বললেন, এটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং গল্প! এ-রকম গল্প কি তোমার স্টকে আরও আছে?

জি আছে।

আলিমুর রহমান বললেন, একটা কাজ কর, এই গল্পটা মৃন্ময়ীকে শুনিয়ে আস। এক্ষুনি যাও। গল্প শুনে তার রিএকশন কেমন হয় আমি দূর থেকে দেখব।

জহির সিগারেট ধরাল। তার ইচ্ছা করছে এই বুড়োকে কিছু কঠিন কথা শুনাতে। জীবনটা সিনেমা না এবং এই বৃদ্ধ স্ক্রিপ্ট রাইটার না। তাঁর স্ক্রিপ্ট মতো একটা ছেলে যাবে এবং তাঁর আদরের নাতনীর সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করবে। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে তিনি আহ্লাদ পাবেন।

আলিমুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, কী হলো যাচ্ছ না কেন?

জহির রওনা হলো। মৃন্ময়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মৃন্ময়ী বলল, দাদাজান আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাই না?

জহির বলল, জি।

মৃন্ময়ী বলল, কী বলতে হবে, তাও কি বলে দিয়েছেন?

জহির বলল, না।

মৃন্ময়ী বলল, দাদাজানের অতি ছেলেমানুষী শখের একটা হচ্ছে আমার কোনো একটা ছেলের সঙ্গে ভাব হবে। তাকে নিয়ে আমি এই খামারবাড়িতে আসব। দুজনে হাসব, গল্প করব— তিনি দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে মজা পাবেন। এখন আমি যদি আপনাকে নিয়ে পুকুর ঘাটে যাই, কিছুক্ষণের মধ্যেই কোনো একটা গাছের আড়ালে দাদাজানকে দেখা যাবে। তাঁর হাতে থাকবে বাইনাকুলার। বাইনাকুলার দিয়ে তিনি দেখার চেষ্টা করবেন, আমরা কী করছি। আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে পুকুর ঘাটে?

আপনি আদেশ করলে যাব।

আচ্ছা যান আদেশ করছি। আসুন আমার সঙ্গে।

অনেকক্ষণ হলো দুজন পুকুরঘাটে। আশেপাশে কোথাও আলিমুর রহমানকে দেখা যাচ্ছে না। মৃন্ময়ী হাসতে হাসতে বলল, দাদাজানের এত সময় লাগছে কেন কে জানে? মনে হয় বাইনাকুলার খুঁজে পাচ্ছেন না।

জহির হেসে ফেলল। মৃন্ময়ী বলল, এই প্রথম আপনাকে আমি হাসতে দেখলাম। দাদাজান যখন ভেংচি কাটছিল তখনও আপনি হাসেন নি। আপনার হাসি সুন্দর! আপনি ঘনঘন হাসবেন। মনে থাকবে?

থাকবে।

এইবার দাদাজানকে দেখা যাচ্ছে। কাঁঠালগাছের পেছন থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। বলেছিলাম না হাতে বাইনাকুলার থাকবে! হাতে বাইনাকুলার!

শাহেদুর রহমানের সামনে ফরিদ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সংসার চালানোর কিছু টাকা আজ লাগবেই। বাজার হবে না এমন অবস্থা। স্যারকে ব্যাপারটা যেভাবেই হোক বুঝিয়ে বলতে হবে। বুঝিয়ে বলাটা তার জন্যে কঠিন। সে কাউকেই বুঝিয়ে কিছু বলতে পারে না। মৃন্ময়ী ম্যাডামকেও সে বুঝিয়ে বলতে পারে নি যে রাত সাড়ে এগারোটার টেলিফোনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মৃন্ময়ী ম্যাডাম হয়ত ধরেই নিয়েছেন সে-ই টেলিফোন করে।

শাহেদুর রহমান ফরিদের দিকে না তাকিয়েই বললেন, আমাকে কিছু বলতে এসেছ?

ফরিদ বলল, জি স্যার!

টাকা লাগবে। টাকা ছাড়া সংসার অচল। এই তো বলবে?

জি স্যার!

সামনের চেয়ারটায় বোস।

স্যারের সামনে বসে ফরিদের অভ্যাস নেই। সে জড়সড় হয়ে বসল। তার মাথা আরও ঝুলে গেল।

শাহেদুর রহমান বললেন, ফরিদ তুমি তাশ খেল?

ফরিদ চমকে উঠে বলল, জি না স্যার!

তাশ চিন তো? না কি তাশও চেন না?

তাশ চিনি।

শাহেদুর রহমান হাসি হাসি মুখে বললেন, তাশ আছে দুই রঙের— কালো এবং লাল। কালো হলো রাতের প্রতীক, লাল হলো দিনের। বুঝেছ?

জি স্যার!

তাশ চার ধরনের— স্পেড, ক্লাভস, ডায়মন্ড এবং হার্ট। এই চার ধরন

হচ্ছে চার ঋতুর প্রতীক— শীত, গ্রীষ্ম, শরত, হেমন্ত। বুঝেছ?

জি স্যার!

প্রতিটি গ্রুপে তাশ আছে তেরোটা করে। এই তেরো হলো লুনার সাইকেলের প্রতীক। বৎসরে লুনার সাইকেল আছে তেরোটা। ঠিক আছে?

জি স্যার!

এখন তুমি তাশের নাম্বারগুলি যোগ কর। গোলাম এগারো, বিবি বারো, সাহেব তেরো। যদি যোগ কর তা হলে যোগফল হবে ৩৬৫, একটা বৎসরে দিনের সংখ্যা হলো ৩৬৫। পুরো ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াল?

ফরিদ কী উত্তর দিবে বুঝতে পারছে না! সংসার আটকে গেছে টাকার জন্যে, এখানে তাশের ভূমিকাটা কী?

শাহেদুর রহমান বললেন, চেক বই আন। এখন চেক ফেরত আসবে না। ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফরিদ পকেট থেকে চেক বই বের করল। শাহেদুর রহমান চেক বইয়ে দস্তখত করতে করতে বললেন, ব্যাংক থেকে টাকা আনার পথে এক প্যাকেট তাশ কিনে আনবে। গুনে দেখবে যোগ ফল ৩৬৫ হয় কি না।

জি আচ্ছা স্যার!

ফরিদের খুব ইচ্ছা করছে জানতে সমস্যার সমাধান কীভাবে হলো। বড় সাহেব কি ছেলেকে ক্ষমা করেছেন। ব্যাংকে টাকা জমা পড়েছে? ছোট মানুষের বড় বড় বিষয় জানতে চাওয়া উচিত না। কিন্তু ছোট মানুষরা তো হঠাৎ হঠাৎ অনুচিত কাজ করে ফেলে।

শাহেদুর রহমান বই হাতে তাঁর পড়ার চেয়ারে বসলেন। তাঁর হাতে নতুন একটা বই Diseases Treated with Fruits. লেখকের নাম Xiu Zongchang. ফলমূল দিয়ে অসুখ সারানোর কৌশল জানা থাকা ভালো।

রাতকানা রোগ

ক. প্রতিদিন সকালে একটা করে গাজর দশ দিন ধরে খেতে হবে।

খ. পাঁচশ গ্রাম পালং শাক পিষে রস করে দিনে দুবার খেতে হবে। দশ দিন।

প্রতিটি অষুধই দশদিন ধরে খাওয়ার বিধান কেন এটা নিয়ে শাহেদুর রহমান চিন্তা করছেন। দশ দিনের হিসাবটা বুঝা যাচ্ছে না। লোকজ চিকিৎসা চন্দ্র

হিসেবে করা হয়। দশ দিন কোনো হিসাবেই যায় না।

ব্যাংক থেকে টাকা পেতে ফরিদের সমস্যা হলো না। ইচ্ছা করলে সে ব্যাংক-ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করতে পারত। জিজ্ঞেস করল না। তার টাকা তোলা দিয়ে কথা। সে টাকা তুলবে, এক প্যাকেট তাশ কিনে ঘরে ফিরবে। বসে বসে গুনবে। গুনে দেখবে ৩৬৫ হয়েছে। তার কাজ শেষ।

মৃন্ময়ী তার মা'র ঘরে। মৃন্ময়ীর হাতে কফির কাপ। কফিতে সে চুমুক দিচ্ছে না। কফির তিতকুটে স্বাদ তার ভালো লাগে না। তবে কফির গন্ধ ভালো লাগে। মগভর্তি কফি হাতে বসে থাকলে মাঝে মাঝে কফির গন্ধ পাওয়া যায়।

শায়লা আজ অনেক ভালো। তিনি তাঁর ঘরের জানালা খুলে দিয়েছেন। ঘরে রোদ ঢুকেছে।

মৃন্ময়ী বলল, মা শুনলাম বাবার টাকাপয়সা সমস্যার নাকি সমাধান হয়ে গেছে।

জানি না।

মৃন্ময়ী বলল, জানবে না কেন? অবশ্যই জান। আমার তো ধারণা কলকাঠি তুমিই নেড়েছ।

শায়লা বললেন, তুই কি ঝগড়া করতে এসেছিস?

মৃন্ময়ী বলল, ঝগড়া না, আমি জানতে এসেছি।

শায়লা বললেন, তোর বাবা পাওয়ার অব এটর্নি পেয়েছে।

মানে কী?

এত কিছু ব্যাখ্যা করতে পারব না। আইনের সব কিছু আমি বুঝি না।

মৃন্ময়ী বলল, তুমি যতটুক বুঝেছ ততটুক বল।

শায়লা বললেন, কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে। কোর্টের সিদ্ধান্ত হলো তোর দাদাজান মানসিকভাবে সুস্থ না। তিনি তাঁর বিরাট সম্রাজ্যের বিলিব্যবস্থা করতে অক্ষম। কাজেই উনার সবকিছু দেখাশোনার দায়িত্ব এখন তোর বাবার।

মৃন্ময়ী বলল, কোর্ট কি দাদাজানের সঙ্গে কথা বলেছে?

শায়লা বললেন, তুই আমার সঙ্গে চিৎকার করছিস কেন? আমি তো কোর্ট না?

আমি চিৎকার করছি না। তোমরা একজনকে পাগল বানিয়ে ফেললে?

শায়লা বললেন, যে তোর বাবাকে পাতার পর পাতা গাধা লিখে পাঠায় সে

পাগল না? তোর বাবা গাধা?

দাদাজানের কাছে গাধা। একজন বাবার কাছে তার অতি বুদ্ধিমান পুত্রও গাধা হতে পারে।

শায়লা বললেন, তোর সঙ্গে তর্ক করব না। যে মানুষ চেনে না জানে না এমন এক কাজের মেয়েকে বারিধারার চারতলা বাড়ি লিখে দেয় সে গাধা না?

মৃন্ময়ী বলল, কাজের মেয়েকে না দিয়ে তিনি যদি কোনো ইউনিভার্সিটিকে লিখে দিতেন তাহলেও কি তাঁকে গাধা বলতে? না কি তখন তিনি আরেকটু উন্নত 'ঘোড়া' বলতে?

শায়েলা বললেন, তুই রেগে যাচ্ছিস। মানুষটার কাজকর্ম একটু চিন্তা করে দেখ, দিন-রাত নেংটি পরে বসে থাকে।

উনি উনার নিজের জায়গায় নেংটি পরে থাকেন। নেংটি পরে তোমাদের কাছে আসেন না। মহাত্মা গান্ধীও কিন্তু নেংটি পরেই ঘুরতেন।

মৃন্ময়ী তুই আমার সামনে থেকে যা। আমি তোর দাদাজানকে পাগল বলি নি। কোর্ট বলেছে। ডাক্তাররা সার্টিফিকেট দিয়েছেন। নিউরোলজিস্টরা রিপোর্ট দিয়েছেন। যে নিউরোলজিস্ট তাঁর চিকিৎসা করছেন তাঁর রিপোর্ট আছে। প্রফেসর সালাম। তুই প্রফেসর সালামের সঙ্গে কথা বল।

মৃন্ময়ী মায়ের সামনে থেকে উঠে গেল। তার অস্থির লাগছে। বাবার সঙ্গে এক্ষুনি সে কঠিন যুদ্ধে যাবে, না কি নিজেকে খানিকটা সামলে নেবে এটা বুঝতে পারছে না। সে প্রচণ্ড রেগেছে। এত রেগে থাকলে লজিক এলোমেলো হয়ে যায়। বাবা শান্ত লাজিকের মানুষ। মৃন্ময়ী দেরি করল না। চারতলায় উঠা শুরু করল। রান্নাঘর থেকে আরেক কাপ গরম কফি নিয়ে নিল। নিজের নার্ভ ঠাণ্ডা রাখার জন্যে তার কফির গন্ধ দরকার।

শাহেদুর রহমান বই পড়ছিলেন। মেয়েকে দেখে হাত থেকে বই নামিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, হ্যালো বিবি।

মৃন্ময়ী বলল, জ্ঞানচর্চা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা যায়?

শাহেদুর রহমান, বললেন, জ্ঞানচর্চা বন্ধ রাখা অন্যায়, তবে আমার BB-র জন্য বন্ধ করা হলো। মা! রেগে আছ কেন?

মৃন্ময়ী বলল, বাবা! দাদাজান কেমন মানুষ?

শাহেদুর রহমান বললেন, অতি জটিল প্রশ্ন। প্রতিটি মানুষই একেক জনের কাছে একেক রকম। তোমার দাদাজান তোমার কাছে এক রকম, আমার কাছে আরেক রকম। আবার কাজের মেয়ে বিন্তির কাছে অন্যরকম।

তোমার কাছে কেমন?

আমার কাছে উনি ইন্টারেস্টিং একজন মানুষ। প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি, জানার প্রচণ্ড আগ্রহ। ক্লাস এইটে পড়া বিদ্যা নিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন। টাকা রোজগারের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনার দিকে নজর দিলেন। টিচার রেখে অবসর সময়ে পড়েছেন। আমি দিনরাত পড়ি, এই জিনিসটা উনার কাছ থেকে পেয়েছি।

এই মানুষকে তুমি পাগল ডিক্লেয়ার করছ?

শাহেদুর রহমান বললেন, সামান্য ভুল হলো মা। উনি নিজেই নিজেকে পাগল ডিক্লেয়ার করেছেন। তিনি যে দানপত্র করেছেন তার কপি আমার কাছে আছে, পড়লেই বুঝবে। পড়তে চাও?

না।

একটা কথা বলি— তিনি বেশ বড় অংকের টাকা রেখেছেন ঢাকা শহরকে ভিক্ষুক মুক্ত করার পরিকল্পনার জন্যে। তাঁর প্রস্তাব ঢাকা শহরের সব ভিক্ষুককে ধরে বড় একটা জাহাজে করে বঙ্গোপসাগরের কোনো নির্জন দ্বীপে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে। আর খোঁজখবর নেয়া যাবে না। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। প্রতি বছর জাহাজ যাবে। সব খরচ তোমার দাদাজানের। ঢাকা ভিখিরি মুক্ত হবার পর অন্যান্য বড় শহর একে একে ধরা হবে।

উইলে এরকম আছে না কি?

হ্যাঁ আছে। আমাকে উনি গাধা ভাবেন, অকর্মণ্য অলস ভাবেন— তাতে কিছু যায়-আসে না। আমাকে গাধা-অকর্মণ্য-অলস উনি বানিয়ে রেখেছেন। তাঁর লক্ষ্য একটাই— আমি যেন কিছু করতে না পারি। গুলশানের জমি কিনলাম খুব আগ্রহ নিয়ে, একটা কাজ শুরু করব। কোর্ট ইনজাংশান দিয়ে কাজ বন্ধ করে দিল। তার পেছনে কে? তোমার দাদাজান। উনাকে জিজ্ঞেস করলেই জানবে।

মৃন্ময়ী বলল, তিনি তোমাকে দেখতে পারেন না কেন?

একটা কারণ এই হতে পারে যে, আমি বাবার আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ বের করার চেষ্টা করেছি। যাদের পেয়েছি চাকরি দেবার চেষ্টা করেছি। তোমার দাদাজান এটা একেবারেই পছন্দ করেন নি। ফরিদ ছেলেটার কথাই ধর। তোমার দাদাজানের আপন ভাইয়ের ছেলের ছেলে।

এই ছেলে এটা জানে?

জানে না। না জানাই ভালো।

মৃন্ময়ী উঠে দাঁড়াল। শাহেদুর রহমান বললেন, মা রাগটা কি সামান্য

কমেছে?

মৃন্ময়ী জবাব না দিয়ে বের হয়ে গেল। শাহেদুর রহমান ডাকলেন ফরিদ। ফরিদ ঘরে ঢুকল। শাহেদুর রহমান বললেন, তাশের নম্বরগুলি যোগ করে দেখেছ কত হয়?

৩৬৪ হয় স্যার! ৩৬৫ হয় না।

তাশের প্রতিটি প্যাকেটে একটা জোকার থাকে। জোকারের নাম্বার এক। ঐ একও যোগ করতে হবে।

জি আচ্ছা স্যার!

মৃন্ময়ী তার কফির মগ ফেলে গেছে। মগটা দিয়ে আসো।

ফরিদ মগ নিয়ে বের হলো।

মৃন্ময়ীর ঘরের দরজা পুরোপুরি বন্ধ না, সামান্য খোলা। ফরিদ দরজায় টোকা দিল। ভীত গলায় বলল, ম্যাডাম! আমি ফরিদ। আপনার কফির মগ ফেলে এসেছিলেন।

ভেতরে আসুন।

ফরিদ মগ নিয়ে ঢুকল। মৃন্ময়ী বলল, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলুন। আমি দাদাজানকে দেখতে যাব।

জি আচ্ছা! ম্যাডাম আমার একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

বলুন।

রাত সাড়ে এগারোটায় টেলিফোন করা বিষয়ে। আমি টেলিফোন করি না।

একবার তো বলেছেন। আবার কেন?

আপনি মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই। এইজন্য আবার বললাম। আমি প্রমাণ দিতে পারি যে টেলিফোন আমি করি নাই।

মৃন্ময়ী বলল, কী প্রমাণ?

ফরিদ হড়বড় করে বলল, আমি যদি টেলিফোন করতাম তা হলে যেদিন আমাকে ধরলেন তারপর থেকে টেলিফোন করা বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু তারপর টেলিফোন করা বন্ধ হয় নাই।

মৃন্ময়ী বলল, আপনি কীভাবে জানলেন টেলিফোন করা বন্ধ হয় নি?

ফরিদের মাথা ঝুলে পড়ল।

মৃন্ময়ী বলল, শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকবেন না। সামনে থেকে যান। ঐ দিনের মতো চৌকাঠে বাড়ি খাবেন না। সাবধানে যান।

ফরিদ সাবধানেই বের হলো। তার মন খুবই খারাপ। টেলিফোন সে করে

না। কী করে মৃন্ময়ী ম্যাডামকে এই কথাটা বুঝাবে? তার ইচ্ছা করছে দেয়ালে মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেলতে। তাতে লাভ কী?

আলিমুর রহমান আমবাগানে হাঁটাহাঁটি করছেন। আজ তাঁর গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবি পরেছেন। লুঙ্গির রঙও গেরুয়া। হাঁটার ভঙ্গিতে কোনো অস্থিরতা নেই। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে না তিনি চিন্তিত কিংবা বিষণ্ন।

মৃন্ময়ী অনেকক্ষণ হলো এসেছে। সে বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছে। বারান্দায় দুটা চেয়ার মুখোমুখি। মাঝখানে টেবিল। ম্যানেজার কালাম পট ভর্তি চা রেখেছে। মৃন্ময়ী চা ঢালে নি। সে দাদাজানের জন্য অপেক্ষা করছে। মৃন্ময়ী যে এসেছে তিনি জানেন। দূর থেকে দেখেছেন। হাত নেড়েছেন। আলিমুর রহমানের নির্দেশ আছে আমবাগানে হাঁটাহাঁটির সময় কেউ তাঁর কাছে আসতে পারবে না। এই সময় তিনি কিছু জটিল চিন্তা করেন।

আলিমুর রহমানের জটিল চিন্তা মনে হয় শেষ হয়েছে। তিনি এগিয়ে আসছেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি।

মৃন্ময়ী আছিস কেমন?

ভালো।

তোর জন্যে আমি নতুন একটা নাম ঠিক করেছি— মীন। মীন হলো মাছ। মৃন্ময়ী কঠিন নাম। মাছ অনেক সহজ। তোর বাবা যেন তোকে কী ডাকে?

BB ডাকে। Blue Bird.

গাধা তো! গাধা মার্কা নাম দিয়েছে।

দাদাজান চা খাবে?

হুঁ।

মৃন্ময়ী চা ঢালতে ঢালতে বলল, আমবাগানে হাঁটতে হাঁটতে জটিল চিন্তা কী করলে?

আলিমুর রহমান আনন্দিত গলায় বললেন, ঠিক করেছি বাকি জীবন ভিক্ষা করে পার করব। দুপুর বেলা এর-তার বাড়িতে থালা নিয়ে উপস্থিত হব। কান্না-কান্না গলায় বলব, মাগো চাইরটা ভাত দেন। তোদের বাড়িতেও একদিন যাব।

তোমার ভিক্ষুক জীবন কবে থেকে শুরু হচ্ছে?

যে কোনোদিন শুরু হয়ে যেতে পারে। আজ বিকেলেও বের হয়ে পড়তে পারি।

মৃন্ময়ী চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, তোমার মাথা তো আসলেই খারাপ।

আলিমুর রহমান বললেন, এই দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের মাথাই খারাপ। কারোর এক দাগ খারাপ, কারোর দুই দাগ খারাপ। আমার পুরোটাই খারাপ।

বাবা পাওয়ার অব এটর্নি বের করে খুব ভুল তাহলে করে নি?

যা করেছে। ঠিকই করেছে। গাধাটা যে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজটা করেছে এতেই আমি খুশি।

মৃন্ময়ী বলল, দাদাজান তুমি কোর্টে যাও। আমি থাকব তোমার সঙ্গে। তোমার রোজগারে তোমার কোনো অধিকার থাকবে না এটা কেমন কথা?

কোনো দরকার নাই। ঝোলা হাতে রাস্তায় নামব। ভাবতেই মজা লাগছে। কেউ কিছু বলতেও পারবে না, কারণ আমি পাগল মানুষ।

মৃন্ময়ী বলল, তুমি সত্যি সত্যি ভিক্ষা করতে বের হবে?

অবশ্যই। আমবাগানে হাঁটাহাঁটি করে এইটাই ভাবছিলাম। ভিক্ষা করার এই আইডিয়া কার কাছ থেকে পেয়েছি জানিস? ফজলুর কাছ থেকে।

ফজলু কে?

জহিরের আর্টিস্ট বন্ধু। যাকে চিকিৎসার জন্যে বাইরে পাঠানোর কথা। ভালো কথা, সব ব্যবস্থা করেছি। ঐ ছেলে হয়ত চলেও গেছে। ছেলেকে দেখতেও গিয়েছিলাম। বাঁচার কোনো কারণ নেই। দেশে মরার বদলে সে মরবে বিদেশে। এইটুকু যা লাভ।

মৃন্ময়ী বলল, দাদাজান আমি কি তোমাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?

আলিমুর রহমান বললেন, পারিস।

মৃন্ময়ী বলল, তুমি এইখানেই থাকবে। এখান থেকে বের হবে না। আমি এসে তোমার সঙ্গে বাস করব।

আলিমুর রহমান শান্ত এবং স্পষ্ট স্বরে বললেন, না। গাধাপুত্রের দয়ায় আমি বাস করব না। মীন শোন, আমি এইমাত্র ঠিক করলাম আজ রাতেই গৃহত্যাগ করব। ভিক্ষার ঝুলি হাতে বের হব।

মৃন্ময়ী বলল, ভালো।

আলিমুর রহমান আনন্দের হাসি হাসতে হাসতে বললেন, পোষাকও ঠিক করে ফেলেছি। লুঙ্গি এবং একটা চাদর।

মৃন্ময়ী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, দাদাজান আমি এখন উঠব। তোমার উদ্ভট কথা শুনতে আর ভালো লাগছে না।

ঢাকায় রওনা হবার আগে আগে মৃন্ময়ী ম্যানেজার কালামকে ডেকে বলল,

আমি গেট দিয়ে বের হবার পর পর আপনি গেটে তালা লাগিয়ে দেবেন। দাদজান যেন বের হতে না পারেন। উনার মাথা এখন পুরোপুরি খারাপ। উনি ঠিক করেছেন পথে পথে ভিক্ষা করবেন। এটা করতে দেয়া যাবে না। আপনার প্রধান কাজ উনাকে এই কম্পাউন্ডে আটকে রাখা। ঠিক আছে?

জি ঠিক আছে।

সব সময় তাঁকে চোখে চোখে রাখবেন। যেন পালাতে না পারেন।

আমি বুঝতে পরছি আপা।

কোনো রকম সমস্যা হলে আমাকে টেলিফোন করবেন। কিংবা বাবাকে।

জি আচ্ছা।

আলিমুর রহমান সন্ধ্যাবেলা বের হতে গিয়ে বুঝতে পারলেন তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে।

ম্যানেজার কালাম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, স্যার আপনি যা বলবেন তাই শুনব, কিন্তু গেট খুলব না।

আমার হুকুম এখন আর চলবে না?

স্যার! আপনার হুকুম অবশ্যই চলবে কিন্তু আমি গেট খুলব না।

আলিমুর রহমান পুকুরঘাটে গিয়ে বসলেন। সারারাত বসে রইলেন। পরের দিনও বসে রইলেন। কিছুই খেলেন না। রাত আটটায় শাহেদুর রহমান এসে বললেন, বাবা গেট খুলে দিয়েছি আপনি যেতে চাইলে যান।

আলিমুর রহমান বললেন, থ্যাংক য়্যু।

শাহেদুর রহমান বললেন, আমার প্রতি কি আপনার কোনো আদেশ আছে?

আলিমুর রহমান বললেন, মীনা নামের একটা মেয়ের জন্যে আমি দানপত্রে কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম সে যেন তা পায়।

শাহেদুর রহমান বললেন, বাবা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার দানপত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। শুধু ভিক্ষুক নির্মূল পালন করা যাবে না, কারণ আপনিও তো ভিক্ষুক। তা হলে তো আপনাকেও জাহাজে করে দ্বীপে ফেলে দিয়ে আসতে হয়।

আলিমুর রহমান বললেন, ভিক্ষুক দেখতে পারি না, কারণ আমার বাবা ছিলেন ভিক্ষুক। হাটবারে ভিক্ষা করতেন।

শাহেদুর রহমান বললেন, আপনার সঙ্গে ভাত খেতে ইচ্ছা করছে। আর

হয়ত আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। ভাত দিতে বলি?

দিতে বল। আর শোন জহির নামের যে আর্টিস্ট ছেলে আছে তার সঙ্গে মৃন্ময়ীর বিয়ে দেয়া যায় কিনা দেখিস। ছেলেটাকে কোনো কারণ ছাড়াই আমার পছন্দ হয়েছে।

শাহেদুর রহমান বললেন, বাবা আপনার হাতটা একটু ধরি?

আলিমুর রহমান বললেন, না।

তিনি রাত এগারোটায় আনন্দের সঙ্গেই গৃহত্যাগ করলেন।

জহির ছবি আঁকছে। টুনটুনি তার সামনে বসে আছে। সে গভীর আগ্রহে ছবি আঁকার কর্মকাণ্ড দেখছে। শিশুরা যেমন করে— এটা-সেটায় হাত দেয়, তা করছে না। একবার শুধু রঙের টিউবের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, জহির কঠিন-চোখে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

মীনা ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ ছবি আঁকা দেখল। মেয়ের পাশে বসতে বসতে বলল, ভাইয়া কীসের ছবি আঁকছ?

জহির বলল, বিরক্ত করিস না।

বিরক্ত করছি না তো। কীসের ছবি আঁকছ জিজ্ঞেস করলাম।

আঁকা শেষ হোক তখন দেখবি।

ভাইয়া চা খাবে? চা দেব?

না।

মীনা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, টুনটুনিকে একটু দেখে রেখো। আমি জরুরি একটা চিঠি লিখছি।

জহির জবাব দিল না।

মীনা চিঠি লিখছে জহিরকেই। গত দুদিন ধরে লেখা হচ্ছে। চিঠি আগাচ্ছে না। গতকাল যতটুকু লেখা হয়েছে, সেটা ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখছে। হাতের লেখা ভালো হয় নি। কাকের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লেখা দেখলে ভাইয়া বিরক্ত হতে পারে। তার প্রধান সমস্যা লাইন সোজা হয় না। রুলটানা কাগজ হলে সুবিধা হতো। স্টেশনারি দোকানে গিয়েছিল রুলটানা কাগজ পাওয়া যায় নি। আজকাল মনে হয় রুলটানা কাগজের চল উঠে গেছে। মীনা চিঠিটা শুরু করেছিল—

ভাইয়া

আমার সালাম নিও।

এইটুকু লিখে মনে হয়েছে আমার সালাম নিও বাক্যটার প্রয়োজন নেই। সে

যদি খুলনায় থাকতো তা হলে লেখা যেত। তারা দুজন তো একই বাসায় থাকে। 'আমার সালাম নিও' বা 'তুমি কেমন আছ?' এইসব লেখা অর্থহীন। সে চিঠিটা আবার নতুন করে শুরু করেছে।

ভাইয়া,

তুমি আমার মেয়ে টুনটুনিকে দেখতে পার না কেন? সেকি কেনো দোষ করেছে? না-কি সে দেখতে খারাপ? নাক বোঁচা, গায়ের রঙ কালো। এতদিন তোমার সঙ্গে আছি তুমি একটা দিনও টান দিয়ে মেয়েকে কোলে নাও নি, বা গালে হাত দিয়ে আদর কর নি। ঐ দিন মেয়েটার এমন জ্বর উঠল— মাথায় পানি দিলাম, জলপট্টি দিলাম। তুমি শুধু জিজ্ঞেস করলে, 'জ্বর কি বেশি?' আমি রাগ করে বললাম, জ্বর বেশি না। সামান্য মাত্র একশ তিন। তুমি টুনটুনির কপালে হাত দিয়ে জ্বরটা পর্যন্ত দেখলে না।

প্রতিদিন বাইরে থেকে বাসায় আস। কখনও তোমার ভাগ্নির জন্য একটা কিছু এনেছ? একটা চকলেট কিংবা একটা লজেন্স। চকলেট বা লজেন্স কেনার টাকা তোমার নাই এটা ঠিক না। তোমার যে জিনিসটা নাই তার নাম 'ভালোবাসা'।

তুমি টুনটুনিকে দেখতে পার না এর জন্যে আমার মনে খুব কষ্ট। কারণ টুনটুনিকে আমি তো তোমার হাতেই রেখে যাচ্ছি। বাকি জীবন তুমিই তো তাকে দেখবে। আর কে দেখবে? তোমাকে বিষয়টা পরিষ্কার করে বলি।

ভাইয়া সবুজ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। খবরের কাগজে উঠেছে। তুমি তো খবরের কাগজ পড় না, তাই জান না। আমি বাড়িওয়ালার বাড়িতে গিয়ে রোজ কাগজ পড়তাম। সবুজের বিষয়ে কাগজে কিছু উঠে কি-না জানার জন্যেই পড়তাম। কাগজে লিখেছে সবুজ তার অপরাধের কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। পুলিশের মার খেয়ে মিথ্যাকে সত্যি বলছে এটা তো বুঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কোর্ট তো এইসব বুঝবে না। জজ সাহেব ফাঁসির হুকুম দিয়ে বসবেন। তারা তো ফাঁসি দিয়েই খালাস। তখন আমার কী হবে? আমি কীসের আশায় বেঁচে থাকব?

তোমার না হয় ভালোবাসা নাই। কারো জন্য তোমার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আমার তো আছে। ভাইয়া, সারারাত আমি জেগে বসে থাকি। আমার ঘুমাতে ভয় লাগে। ঘুমালেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখি। সবুজকে ধরাধরি করে কিছু লোক নিয়ে যাচ্ছে ফাঁসি দেবার জন্যে। আর সে চিৎকার করছে, ময়না আমাকে বাঁচাও! ময়না আমাকে বাঁচাও!

ভাইয়া! আমি তাকে কীভাবে বাঁচাব? আমার হাতে কি কোনো ক্ষমতা আছে। আমি অতি সামান্য একটা মেয়ে, যার কেউ নাই। যার একমাত্র ভাই পর্যন্ত তাকে দেখতে পারে না।

আমি বারোটা ঘুমের ট্যাবলেট কিনেছি। বারোটাতেই কাজ হবে। এরচে' বেশি খেলে সমস্যা হয়। সবুজের সঙ্গে রাগারাগি করে আমি একবার আঠারোটা খেয়ে ছিলাম পরে বমি হয়ে সব বের হয়ে গেছে। খালি পেটে বারোটা খেলে বমি হবে না।

ভাইয়া আমি এই চিঠিটা আমার বিছানার পাশে রেখে যাব। চিঠিতে অনেক বানান ভুল হয়েছে। তুমি কিছু মনে করো না। টুনটুনিকে কখনও তার বাবার মিথ্যা মামলার বিষয়ে কিছু বলবে না। সে হয়ত ভেবে বসবে সত্যি। মনে কষ্ট পাবে। তাকে তার বাবার বিষয়ে ভালো ভালো কথা বলবে। যেমন একবার টুনটুনির রক্ত-আমাশা হয়েছিল, তার বাবা সারারাত তাকে কোলে নিয়ে হাঁটাহাটি করেছে। দু-একটা ভালো ভালো কথা বানিয়ে বানিয়েও বলবে। তুমি তো আবার মিথ্যা কথা বলতে পার না। টুনটুনির মুখের দিকে তাকিয়ে দু-একটা মিথ্যা যদি বল তাতে পাপ হবে না।

টুনটুনিকে তোমার কাছে রেখে যেতে আমার মোটেও খারাপ লাগছে না। কারণ আমি জানি সে খুবই যত্নে বড় হবে। বাবা মারা যাবার পর তুমিই তো আমাকে বড় করেছ। কোনোদিন আমার অযত্ন হতে দাও নি।

ভাইয়া ভালো ছেলে দেখে টুনটুনির বিয়ে দিও। বিয়ের অনুষ্ঠান অবশ্যই ভিডিও করাবে। আজকাল বিয়ের অনুষ্ঠান ভিডিও করার চল উঠে গেছে। আমার মেয়ের বেলায় যেন এ রকম না হয়। ভাইয়া আরেকটা অনুরোধ— বিয়ের দিন সুন্দর একটা শাড়ি কিনে পুরানো ময়লা একটা প্যাকেট করবে।

প্যাকেটের উপর কাউকে দিয়ে লেখাবে—

আমার মা টুনটুনিকে
তার বাবা
সবুজ

এবং টুনটুনিকে বলবে এটা তার বাবা রেখে গিয়েছিলেন।

ইতি
মীনা

চিঠি শেষ করে মীনা খামে বন্ধ করল। ঘুমের ওষুধগুলি খেল। জহিরের পেছনে এসে দাঁড়াল। জহির বলল, পেছন থেকে সরে দাঁড়া। আলো আটকাচ্ছিস।

মীনা বলল, ভাইয়া আমার শরীরটা খারাপ লাগছে আমি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব।

জহির জবাব দিল না। মীনার খুব ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে আদর করে। সে ইচ্ছাটা প্রশ্রয় দিল না। আগ্রহ নিয়ে সে মামার ছবি আঁকা দেখছে দেখুক। কে জানে বড় হয়ে হয়ত সেও মামার মতো ছবি আঁকবে।

মীনা বলল, ভাইয়া টুনটুনিকে নিয়ে মাঝে মাঝে আলিমুর রহমান সাহেবের খামারবাড়িতে বেড়াতে যাবে। জায়গাটা তার খুব পছন্দ।

জহির বিরক্ত হয়ে বলল, তুই কারণ ছাড়া এত কথা বলিস কেন?

মীনা চোখ মুছতে মুছতে বলল, আর বলব না ভাইয়া।

জহির বলল, চোখে পানি চলে এসেছে? চোখে পানি আসার মতো কিছু বলেছি? সামনে থেকে যা।

মীনা ঘুমুতে গেল।

সন্ধ্যা মিলাবার আগে পর্যন্ত জহির জানতেও পারল না মীনা মারা গেছে।

আজ টুনটুনির বিয়ে।

তার মামা সকাল থেকেই কাঁদছেন। মামার জন্যে টুনটুনির খুবই মায়া লাগছে। বিয়ে হচ্ছে বলে তো টুনটুনি জন্মের মতো চলে যাচ্ছে না। মামা যখন

তাকে ডাকবেন তখনই সে ছুটে আসবে।

বিয়েতে বিপুল আয়োজন করা হয়েছে। ছাদে সানাই বাজানোর আয়োজন করা হয়েছে। সানাই বাদকরা এসেছেন কোলকাতা থেকে। সানাই-এর ব্যবস্থা করেছেন টুনটুনির এক আর্টিস্ট চাচু। তাঁর নাম ফজলু।

টুনটুনির যে ক'জন বান্ধবী বিয়ে উপলক্ষ্যে এসেছে তাদের প্রত্যেককে টুনটুনির মামী মৃন্ময়ী একটা করে হীরের নাকফুল দিয়েছেন। বান্ধবীরা সবাই হতভম্ব।

টুনটুনি জহিরের হাত ধরে বলল, মামা ছাদে গিয়ে বোস। সানাই বাজনা শুরু হবে। তুমি যাচ্ছ না বলে শুরু হচ্ছে না।

জহির বলল, তোরা যা, আমি যাব না।

টুনটুনি বলল, মামী একা ছাদে বসে আছে। তুমি পাশে নেই বলে তাঁর মন ভালো নেই।

সানাই বেজে উঠেছে। রাগ ভীমপলশ্রী।

❑

BDeBooks.com

মৃন্ময়ীর মন ভালো নেই

হুমায়ূন আহমেদ

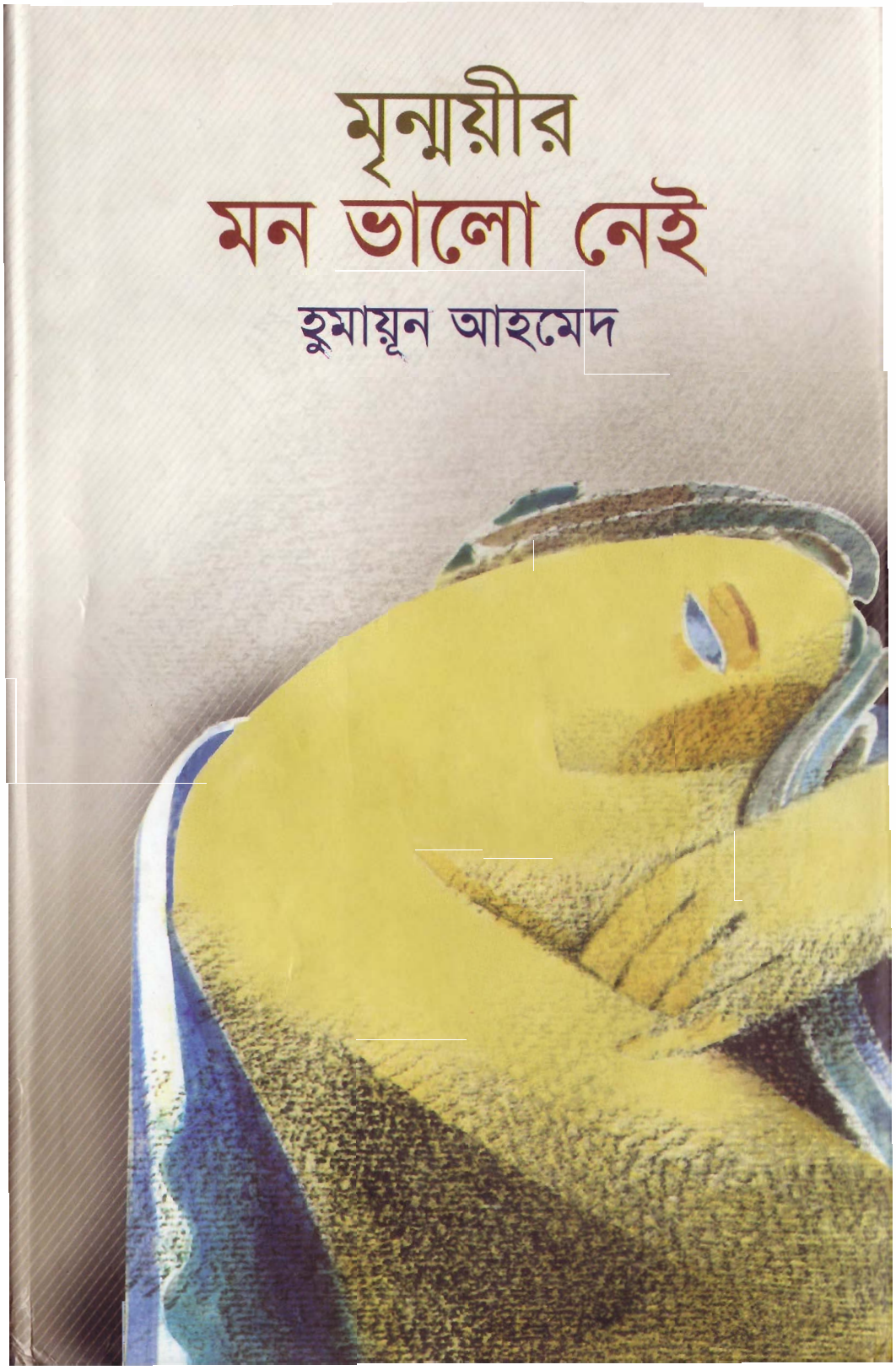

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com